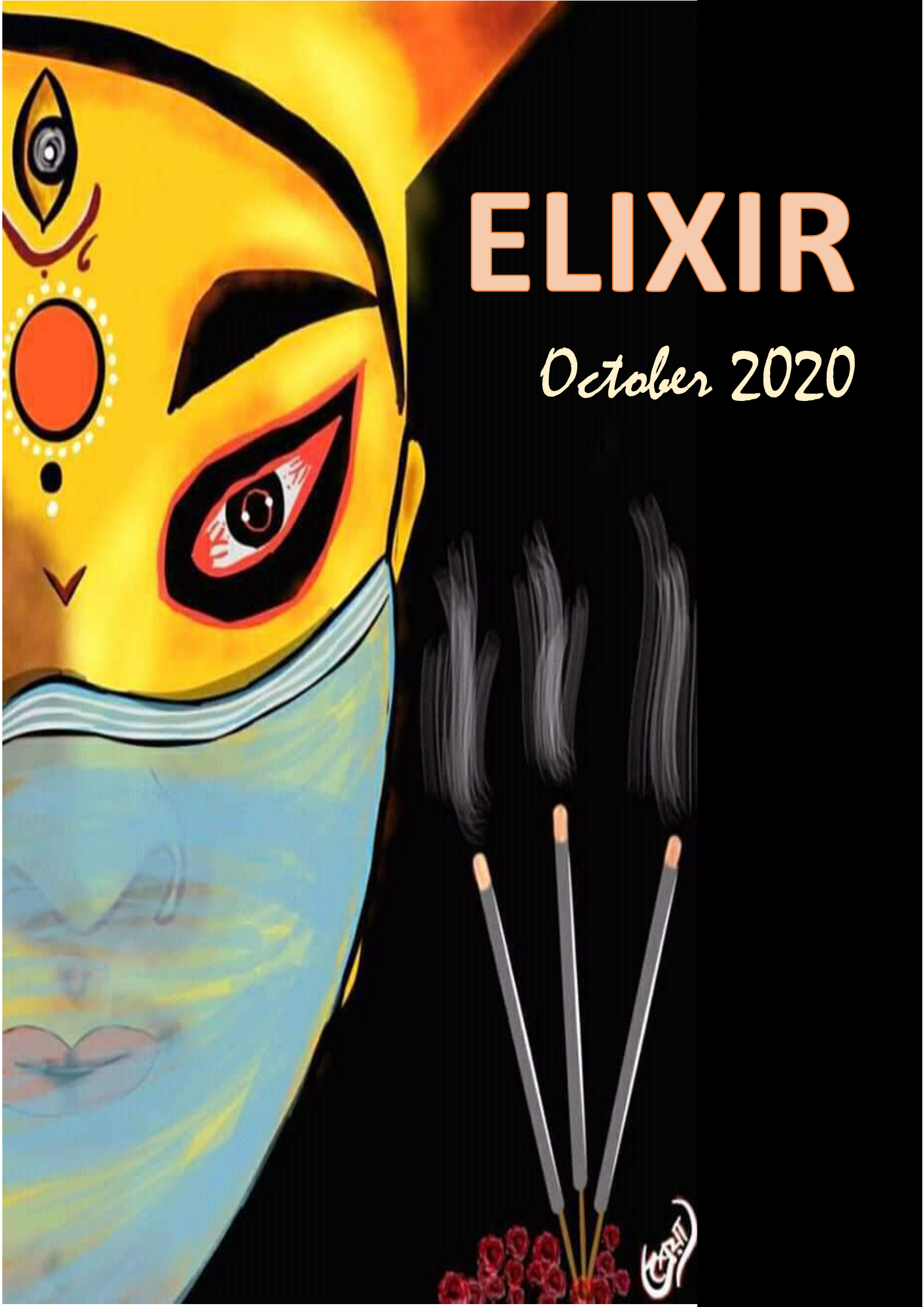

ELIXIR

October 2020

FOREWORD

Durga Puja – the festival of Autumn tune. As it goes without saying, Durga Puja and autumn stand complementary to each other. Though each season comes with its own beauty, autumn has an extraordinary place in nature's art. The sky seems to wash away its last trace of black stain and turns deep blue with the gray clouds leisurely drifting, tired of giving away raindrops. The earth's surface is covered with 'shiuli'. The strong aroma of 'chatim' and the white feathery 'kaash ful' reminds of the glory of the festive season and the rhythmic beats of the 'dhak'.

Every year Kolkata steps out, all dressed up in bright new clothes and accessories setting off for pandal hopping, setting aside the daily stressful routine of regular life. But this year is different. This year we must walk hand-in-hand with the 'new-normal'. Besides accessories; mask, sanitizers, disinfectant sprays must take up some space in our bags. As we gear up to celebrate the spirit of the daring Goddess Durga amidst the pandemic, what strikes our hearts with a loud thud, is the inhuman, brutal, insensible attitude of men over women. "UP Girl's Mutilated Body Found In Field, Family Alleges Rape", "13- year Old Girl Raped And Murdered", "Six-year Old Victim's Eye Damages In Attack"- are headlines that ring loudly, eerily through the evening prayers. The sound of the conch shells is overwhelmed

In its October 2020 issue, Team Elixir brings for you beautiful articles, skillful drawings, excellent photography, candid interviews and an informative guest column. We hope that this issue will help you survive this festive season. We urge our readers to stay at home to give up one year's merry making for peace of a lifetime. We hope that the warm greetings and love that we share with each other this Puja will help the world heal. We hope this world becomes a better place to live in.

Happy Reading

Team Elixir

Express. Enrage. Emblaze.

INTERVIEW

"..অনেক বেশি জোরদার হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার লড়াইটা" ……07
আপনাকে যদি সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে আপনি কোন সার্বজনীন পুজোর দায়িত্ব নিতে চাইতেন আর সেটাকে কি ভাবে পরিবেশন করতেন? ……11
লকডাউনের আগে ও পরে কর্মক্ষেত্রে কতখানি বদল অনুভব করতে পারছেন? ব্যবসার পরিস্থিতি এখন ঠিক কেমন? ……15
"….the moment you think it to be your own, you will definitely win the race" ……22

AROUND THE WORLD

Historiography of Environmental History | Sauro Dasgupta ……26
Freedom of NEP at Ground Zero | Swetlina Mitra ……31
Online Education: Possibility vs Reality | Partha Nandi ……33

BENGALI

অর্ধাঙ্গিনী | দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী……36
একটা সংসারের খোঁজে | প্রকাশ বাড়ৈ……37
ক্লান্ত ধর্ষিতা চেয়েছিল একমুঠো বিশ্রাম | রণবীর পাঁজা……43
একটু ভেবে দেখা যাক | সুজ্জ্বলিতা পাত্র……44
এই তো আমি | দীপজ্যোতি চৌধুরী……46
নিস্তব্ধ কলকাতা | অংশুমান পাল……48

ENGLISH

The Goddess' Garland | Naznee Mahtab ……51
Dear Prufrock| Rusa Bhowmik ……55
Whisker | Sudeshna Chandra ……57

If Paper Could Speak | Abhijit Sarkar.....59
Love's a Bird, set it free| Rodoshee Das 61
And we are torn to shreds? | Anwesha Mandal 64

GUEST COLUMN

Musings on the Real and the Virtual | Ramchandra PN 66

GALLERY

72

SCAN FOR OUR WEBSITE

SCAN FOR OUR FACEBOOK PAGE

Illustrators

Ananya Laha	Partha Nandi	Shreya Bag	Sudeshna Chowdhury
Sumartya Mullick	Shirsha Nandi	Ipsita Sardar	Tiyasa Chatterjee
Addrish Basak	Prodorsita Dhar	Trina Saha	Samrajni Karmakar
Birupaksha Roy	Soumi Banerjee	Pinaki Biswas	Sayanti Pal
Ranjana Sadhukhan	Soumya Kundu	Aryan Shaw	Shreedatri Banerjee
Rajashree Dey	Swati Sharma	Krishh Mukhopadhyay	Subhanko Halder

Working Team, October 2020: Samriddha Roy, Ritwika Chakravarty, Anustup Roy, Arpan Ghosh, Madhurima Roychowdhury, Ashabari Ray, Sudeshna Mukherjee, Arya Bhattacharjee, Ishan Dutta, Rodoshee Das, Rajarshi Banerjee, Akash Kumar, Pramit Sarkar, Shinjini Mukherjee

Cover design: Shreya Bag

INTERVIEW

"...অনেক বেশি জোরদার হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার লড়াইটা"

সুজিত পাল। বয়স ৪৮ বছর। জ্ঞান হওয়ার কাল থেকেই প্রতিমা গড়ার কাজের সাথে যুক্ত একজন মৃৎশিল্পী। এই ভয়ংকর করোনা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই এবার বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবও চলে এসেছে দোরগোড়ায়। দুর্গাপূজার প্রাককালে ওঁর থেকে জেনে নেওয়া গেল পটুয়াপাড়ার হাল-হকীকত।

প্রঃ কার থেকে আপনার এই প্রতিমা গড়ার কাজ শেখা?

উঃ আমি এই কাজ আমার বাবার থেকে শিখেছি। এই কাজ আমাদের বংশ পরম্পরায় অনেক বছর ধরে চলে আসছে।

প্রঃ আপনার পরিবারে কে কে আছেন? কত বছর ধরে আপনাদের পরিবার এই কাজের সাথে যুক্ত?

উঃ আমার বাবা দু বছর হলো মারা গেছেন। খুব পরিচিত মানুষ ছিলেন, সমীর পাল। এখন আমার পরিবারে আমার মা, আমার স্ত্রী এবং আমার একমাত্র কন্যা আছে।

আমার জানা তিন পুরুষ। তার আগে তো এসব অত হত না। তখন হাঁড়ি-কলসির কারবার ছিল।

প্রঃ সকলেই কি প্রতিমা গড়ার কাজে আপনাকে সাহায্য করে?

উঃ আমার মেয়ে এখন পড়াশোনার মধ্যে আছে, ও ক্লাস ১০-এ পড়ে। মা ছোটবেলা থেকে এতদিন পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু ইদানিং ক্যান্সারের পেশেন্ট হওয়াতে না এসবের মধ্যে আর থাকতে চান না। আমার বউ সাহায্য করে। এছাড়াও, আমাদের বাড়িতে অন্তত চোদ্দ থেকে পনেরো জন কারিগর থাকে, তাদের রান্নাবান্না করা, এবং ঠাকুরের সাজের কাজও টুকিটাকি করে।

প্রঃ মূর্তি গড়া থেকে মায়ের সজ্জা, পুরোটাই কি আপনারা করেন, নাকি এই কাজে আলাদা আলাদা ভাগ থাকে?

উঃ না না, সাজের ব্যাপারটা পুরোটা আমরা করতে পারি না। সাজগুলো শ্যামনগর, কাটোয়া, নৈহাটি ইত্যাদি জায়গা থেকে কেনা হয়। ওখানেই ডিজাইন অনুযায়ী অর্ডার দিয়ে সাজ বানিয়ে নেওয়া হয়। তবে মাঝে মাঝে যখন মাটির কিছু সাজ থাকে, যেমন আজকাল অনেক থিম পুজোতে মাটির গয়না ও সাজ ব্যাবহার করা হয়, সেগুলো আমরা করে দিই।

প্রঃ থিম পুজোর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি, এখন তো সাবেকি ও থিম পুজোর জন্যে আলাদা রকম প্রতিমা গড়া হয়। আপনার কোন ধরনের প্রতিমা বেশি ভালো লাগে এবং আপনি কি ধরনের প্রতিমা গড়ে থাকেন?

উঃ অবশ্যই সাবেকি! আমার সাবেকি প্রতিমাই বেশি পছন্দ। আর তা ছাড়া গড়ার সময়েও যেহেতু সাবেকি প্রতিমা একসাথে থাকে, ফলে আমাদের কাজের পক্ষেও সুবিধা হয়। থিম পুজোয় অনেক সময় আলাদা আলাদা করে ঠাকুর থাকেন, সেটা আলাদা করে করতে গেলে কাজের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয় কারণ এক একটা মূর্তি এক এক জায়গায় থাকে, তাই ম্যাচ করাতেও খুব মুশকিল হয় এক এক সময়। এবং এই ধরনের প্রতিমার ক্ষেত্রে লাভের অংশও অনেকটা কম থাকে আমাদের। আমি থিমের ঠাকুর কম করি। হয়তো প্রতি বছর দুটো কি তিনটে। সাবেকি, একচালা, ইত্যাদি ঠাকুরই আমি বেশি বানিয়ে থাকি।

প্রঃ এই অতিমারি পরিস্থিতিতে অন্যান্য বছরের সঙ্গে এই বছরের সামগ্রিক পুজো পরিস্থিতিতে কতখানি ফারাক হয়েছে বলে মনে করেন?

উঃ হ্যাঁ, অনেকটাই ফারাক হয়েছে। অন্যান্য বছর, বছরের এই সময়ে আমাদের শ্বাস ফেলার জো থাকে না। তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটে। এবার কাজের চাহিদা একদমই কম! এখন এমনিতেই মার্কেটের যা অবস্থা, তাতে জিনিসপত্রের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রতিমার দাম পড়ে যাওয়ায় এবার আমাদের লাভের অংশ অনেকটাই কম। অন্যান্য বার যে পরিমাণে ঠাকুরের অর্ডার থাকে, এবার খুব বেশি হলে তার ৬০% কাজ আমরা করছি। এবছর জেলার কাস্টমাররা প্রায় আসেই নি। শুধুমাত্র কলকাতা এবং হাওড়ার কিছু অঞ্চলের মানুষ এসে অর্ডার দিয়ে গেছেন। কুমোরটুলিতে এবার ব্যবসার হাল খুবই খারাপ।

প্রঃ দুর্গাপুজো হল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আর সেটা শুরুই হয় আপনাদের হাত ধরে। প্রতিমা গড়ার সময় আপনাদের অনুভূতিটা ঠিক কীরকম থাকে?

উঃ দুর্গাপুজোর ঠাকুর গড়া আমাদের যেমন জীবিকা, তেমনই ভালো লাগার জায়গাও বটে! ভালো লাগাটা এই জায়গায় যে যদি অনেকগুলো জায়গায় অর্ডার পাই, তখন নিজের মনের মতন নানারকম ভালো কাজ দেখানোর একটা তাগিদ পাই। আর পুজো দেখতে এসে যখন মানুষ বলেন যে, অমুক শিল্পীর এই ঠাকুরটা খুব ভালো হয়েছে, ওই ঠাকুরটা খুব অন্যরকম হয়েছে, তখন তো অবশ্যই একটা ভালো লাগা থাকেই! কিন্তু এবছরের যা পরিস্থিতি, তাতে ভালো লাগার থেকেও অনেক বেশি জোরদার হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার লড়াইটা।

প্রঃ মা দুর্গা তো বছরের এই একটা সময়েই ক'টা মাত্র দিনের জন্য আসেন। এবারের পুজোতে কি আর্জি থাকবে আপনার মায়ের কাছে?

উঃ মাকে এটাই বলবো, যে এবছর যা হয়েছে হয়েছে, এবার সব মানুষ সুস্থ হোক। এই প্যান্ডেমিকের আতঙ্ক থেকে মানুষ যেন তাড়াতাড়ি মুক্তি পায়। এখন রোগের থেকেও সেটাকে জড়িয়ে আতঙ্ক অনেক বেশি, সেটা যেন একেবারে শেষ হয়! এবং মানুষ যেন তাদের জীবিকার পথে আবার আগের মতই শুরু করতে পারেন এবং ভালো থাকেন। মানুষের জীবিকা ভালো হলেই আমাদের ব্যবসাও ভালো হবে। যদি মানুষের আয় না থাকে তাহলে তো আর পুজো ভালো হবে না কখনো! এবারের পুজোতে মানুষ যেন কতক দায়ে পড়ে পুজো করছে। করতে হবে তাই করছে, অনেকটা এরকম ব্যাপার। তাই চাই যাতে মানুষের জীবন-জীবিকা আবার স্বাভাবিক হয়।

একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের এই শিল্পের সাথেও কিন্তু আরো অনেক মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে। যেমন ধরুন, গুজরাটের কাপড়ের মিলে দুর্গা ঠাকুরের কাপড় তৈরি করা হয়। সেই মিলগুলো এখন প্রায় বন্ধ হয় গেছে। সেখানকার কর্মচারীরাও বাংলা থেকেই যায়, তারাও অনেকেই যেতে পারে নি এবার। তার ফলে কাপড়ের দামটাও অনেক চড়া হলে গেছে, কারণ ঠিকঠাক প্রোডাকশন হচ্ছে না। সেখানেও প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে পড়ে রয়েছে। অন্য বারের তুলনায় এবারে সাজেরও তেমন কোনো অর্ডার নেই। কৃষ্ণনগর, বনগাঁবাসীদের খুব করুণ অবস্থা। তারা আমাদের সাজের সাপ্লাই দেয়। তাদের অবস্থা আমাদের থেকেও অনেকগুণ খারাপ। আমার সাথে একজনের কিছুদিন আগেই কথা হচ্ছিল, তখন সে বলেছিল কথায় কথায়, "আমরা খুবই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বেশিরভাগ কর্মচারীর রোজকার খাবার জোগাড়ের সামর্থ্যটুকু নেই আর। তারা অন্য কোনো কাজ জানে না, আর চাষ আপাতত নেই, তাই কি ভাবে যে আমাদের সংসার চলছে, আমরাই বুঝতে পারছি না। জানি না কি হবে ভবিষ্যৎ।" খুবই দুঃখ করে বলেছিল।

প্রঃ এই পরিস্থিতি ঠিক হতে গেলে সাধারণ মানুষের সতর্ক হাওয়াটা খুব প্রয়োজনীয়। কুমোরটুলিতে এই ভয়াবহ অতিমারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে কী কী সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উঃ কুমোরটুলিতে বেশিরভাগ ঠাকুর এবারে অনলাইনে বা ফোনে অর্ডার নেওয়া হয়েছে। এখন যা সব উপায় আছে, এই যেমন PhonePe, Google Pay, বা ব্যাঙ্কে চেক জমা দিয়ে, সেই সব ব্যবহার করেই মানুষ আমাদের প্রাপ্য মূল্য দিয়েছেন। তাঁরাও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখছেন, কুমোরটুলিতে আসতে চাইছেন ন। যার ফলে কুমোরটুলিতে ভিড় খুব একটা দেখতে পাবেন না এইবার। ঠাকুর আর মানুষজন, দুই-ই কম। একমাত্র শনিবার ও রবিবার যারা ফটোগ্রাফি করে, তারা একটু ভিড় করছে।

আমাদের এখানে সমিতি আছে, তারাই দায়িত্ব নিয়ে প্রতি সপ্তাহে দোকানগুলো স্যানিটাইজ করছে এবং সমস্ত দোকানদার, কারিগরদের মাস্কের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে সবসময় মাস্ক পরাটা অসম্ভব। তাই জন্যে আমরা প্রত্যেকটা দোকানকে বলেছি দড়ি দিয়ে বাইরেটা ঘিরে দিতে, যাতে বাইরের ফটোগ্রাফাররা ঢুকে পড়তে না পারে। কিন্তু তারা জোর করেই ছবি তুলতে আসে আর সেটা নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এমনি সুস্থ আছে মোটামুটি সবাই। এই পর্যন্ত কুমোরটুলিতে ঠাকুর গড়ার জায়গাটা কোভিড-শূন্যই আছে।

প্রঃ এই পরিস্থিতিতেও রাজ্য সরকার পুজো করার এবং প্রতিমা পরিদর্শনের অনুমতি দিয়েছে। মানুষ পুজোর সময় ঠিকই বেরোবে ঠাকুর দেখতে। তাতে এই করোনা পরিস্থিতি আরো কতটা খারাপ হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

উঃ খুবই খারাপ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সবাইকে বারবার আবেদন করা হচ্ছে যেন মানুষজ এবছর পুজোতে অযথা রাস্তায় বেরিয়ে প্রচন্ড ভিড় না করে। প্রয়োজন হলে বাড়িতে বসেই যদি টিভিতে বা অনলাইনে ঠাকুর দেখেন, তাহলে মানুষেরই বিপদের আশঙ্কা কমবে। এই যে হঠাৎ করেই পুজোর কেনাকাটার একটা হিড়িক পড়ল, এতে কিন্তু দেখুন সংক্রমণের হার আবার বেড়ে গেছে। এটা যেন না হয়। তাহলে সাময়িক আনন্দ করতে গিয়ে পরে একটা বিশাল সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে।

মাঝেমাঝে আমরা কুমোরটুলিতে দেখি যে ছোট ছোট ছেলমেয়েদের দুর্গা, শিব, ইত্যাদি সাজিয়ে ছবি তুলছে মানুষজন। অন্য বছরে কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু এই বছর আমরা বারবার বারণ করছি এগুলো যেন না করা হয়। মাস্ক না পরিয়ে, শাড়ি পরিয়ে ছবি তুলছে, এটা তো খুবই বিপজ্জনক হতে পারে! আমরা বারবার মাইকে বলছি যে এই জিনিস করবেন না, এতে ছোট বাচ্চাগুলোর ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু কে কার কথা শোনে বলুন! এই যে যারা ছবি তুলছে, তাদের এই আশ্চর্য ব্যবহার দেখে আমি স্তম্ভিত। এই অবস্থায় এসবের কোনো মানেই হয় না। আমাদের অনেক কষ্টে ভিড় কমাতে হচ্ছে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে মানুষের কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সংক্রমিত হওয়ার আতঙ্ক রয়েছে! আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি আগেই। এইসব ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করতে মানুষের যে প্রবল আকর্ষণ, এটা এবছর বড়ই অমূলক। এই ব্যাপারগুলো খুব বিরক্তিকর ও বাজে জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষ যে কী করে এতটা অসচেতন হতে পারে সেটা ভেবেই ভয় হচ্ছে!

আপনাকে যদি সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে আপনি কোন সার্বজনীন পুজোর দায়িত্ব নিতে চাইতেন আর সেটাকে কি ভাবে পরিবেশন করতেন?

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই পুজোটি খুব ভালো লাগে। আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমি বর্তমান একটা বিষয় নিয়ে করতে চাইব। আমি আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে একটা পরিবেশনা করতে চাই। সুন্দরবনের মানুষরা যেই ভাবে এই বিপর্জয়ের সম্মুখীন হয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে মানুষের গতিবিধির পুরোপুরি খেয়াল রাখার চেষ্টা করব। আমি এইভাবে মণ্ডপ সাজাতে চাই।

সাগর অধিকারী

(ফোন বিক্রেতা)

দেশপ্রিয় পার্ক। বিগত কিছু বছর ধরে আমরা দেখছি যে দেশপ্রিয় পার্ক নানা রকমের নতুন ধরেন মণ্ডপসজ্জা ও মাতৃপ্রতিমা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সেই জায়গা থেকে আমারও ইচ্ছা আছে কিছু অন্যরকম তুলে ধরার। আমাদের দেশের যে সব মহাকাব্য আছে আমি সেইখান থেকে কিছু দার্শনিক ঘটনা মণ্ডপসজ্জা হিসাবে তুলে ধরতে চাই। আমি যে সব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গল্প সমাজের টানাপোড়েন হারিয়ে গেছে আমি সেগুলোকে তুলে ধরতে চাই। এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে আমি সব রকম নিয়মাবলি মাথায় রেখে এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব।

হারাধন দাস

(কেরানীর দোকান)

কুমোরটুলি পার্ক। এই মণ্ডপটার নামের মধ্যেই একটা কুমোরটুলির মাটির গন্ধ আছে। তাই ব্যাক্তিগত ভাবে এই মণ্ডপটি আমার খুব পছন্দের। আমাকে যদি মণ্ডপসজ্জার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমি 'বাবু কলকাতা'র একটা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাইব। 'বাবু কলকাতার' একটা আলাদা আমেজ ছিল যা আজকের নতুন কলকাতার থেকে অনেক আলাদা। আমি এই মণ্ডপ নানা রকম পুরনো জিনিস দিয়ে সাজাতে পছন্দ করবো। আমি সাদা-কালো রঙের ব্যবহারে এই মণ্ডপসজ্জা করতে চাই। আরো বলতে চাই এই মহামারীর পরিস্থিতি মাথায় রেখে আমি মণ্ডপসজ্জার ফেসবুক লাইভ করতে চাই, যাতে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। এইভাবে সামাজিক দূরত্ববিধি বজায় থাকবে আর দর্শনার্থীদের জন্য সব রকমের ব্যবস্থাও থাকবে।

স্বপন পাল

(প্রতিমা নির্মাণকারী)

আমি শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে, সুন্দর একটি গ্রাম্য পরিবেশে মায়ের আরাধনা করতে চাই। আমি গড়িয়াহাটের ব্যস্ত অঞ্চলে থাকি, যেখানে অনেক বড় বড় পুজো। তাই সেখানে প্রবল জনস্রোত, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এবং নিয়মের বেড়াজালে কোথাও যেন মায়ের সাথে একাত্ম হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই কলকাতার ব্যস্ত জীবনের ভিড় কাটিয়ে গ্রামের এই পুজোটাকে নিজের মতো করে আমি সাজিয়ে তুলতে চাই। সাদামাটা প্যান্ডেলের মধ্যেই প্রতিমা শিল্পী যখন মায়ের প্রতিমা তৈরি করবেন, আমি সবসময় সেখানে থেকে সৃষ্টির আনন্দ পেতে চাই। মায়ের পরনে থাকবে সাদা লালপেড়ে কাপড়, এবং থাকবে একচালা সাবেকি মূর্তি। কলাবৌকে স্নান করতে নিয়ে যাবার সময় পুকুরের হাঁসগুলোর প্যাঁক প্যাঁক করে পিছিয়ে যাওয়া, আটপৌরে শাড়ি পরে গ্রামের মা-বউদের সাথে আলপনা দেওয়া, পুজোর ভোগ রান্না করে সাজানো, সব কিছুর আনন্দ পেতে চাই। এখানে মেয়েদের জন্যে আলাদা করে কোনো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা করতে হবে না, কিন্তু আলতা সিঁদুর ও বাংলার তাঁতের শাড়িতে সজ্জিত মা-বউদের দেখে এমনিই মন ভরে যাবে। বাংলার মা মেয়েদের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাবো লালপেড়ে সাদা কাপড় পরিহিত মায়ের প্রতিমার। মনে হবে আক্ষরিক অর্থেই মা হলেন আমাদের ঘরের মেয়ে

নূপুর চক্রবর্তী (গৃহবধূ)

একডালিয়া এভারগ্রীন' আমার খুব প্রিয় পুজো। তাই জন্যে আমি এক বছরের জন্যে এই পুজোর দায়িত্ব নিতে চাইব। আমি এই করোনা পরিস্থিতিতে পুজো খুব ছোট করে করব। যাতে বন্ধ প্যান্ডেলের মধ্যে অকারণ ভিড় না হয়, আমি প্যান্ডেলের বাইরে LCD স্ক্রীন লাগাবো যাতে সেখানেই মানুষ ঠাকুর দর্শন করতে পারেন। এছাড়া আমি অনলাইনেও youtube-এ সেই পুজোর ভিডিও দেব যাতে মানুষকে অকারণে বেরোতে না হয়। এবং পুজোর একাংশ টাকা আমি আলাদা করে রাখব যাতে সেই টাকা দিয়ে করোনায় চাকরি হারানো দুস্থ মানুষের কিছু আর্থিক সহায়তা করতে পারি।

সর্বার্থ চক্রবর্তী

১০ (বছর বয়সী ছাত্র)

অভ্র রায় (শিক্ষক)

আমার পাড়ার পুজো, অর্থাৎ সল্টলেক বি এফ ব্লক, আমার খুব প্রিয়। তাই আমি এক বছরের জন্যে এই পুজোর দায়িত্ব নিতে চাইবো। আমি খুব একটা এই বিষয়ে না জানলেও, বড়দের সাহায্য নিয়ে আমি সাবেকি প্রতিমা এনেই পুজো করতে চাইবো। প্যান্ডেলের সব কিছুই গরীব দুস্থ মানুষের সাহায্যে গড়া হবে যাতে তাঁরা অর্থ উপার্জন করতে পারেন খানিকটা। এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের থেকে আমরা সাজানোর জিনিস কিনবো যাতে তাঁরা কাজ পান। প্যান্ডেলের ভিড় কমানোর জন্যে চেষ্টা করব অনেকটাই খোলামেলা রাখার, যাতে মানুষ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন। আশা করি তাতে পুজো ভালোভাবে কাটবে।

লকডাউনের আগে ও পরে কর্মক্ষেত্রে কতখানি বদল অনুভব করতে পারছেন? ব্যবসার পরিস্থিতি এখন ঠিক কেমন?

১১ বছর ধরে তেলেভাজার দোকান চালাচ্ছি। লকডাউনের সময় খুব কষ্টে ছিলাম। জমানো টাকা দিয়ে চলেছিল পুরোটাই। অগাস্ট থেকে আবার দোকান খুলতে পেরেছি। আগের তুলনায় বিক্রিবাট্টা হচ্ছে খারাপ না! লোকজন বাড়ি থেকেই না বেরোলে কোথা থেকে বেচা কেনা হবে? পুজোর সময় দোকান বন্ধ থাকবে। লক্ষ্মী পুজোর পর থেকে আবার খুলব।

স্বপন মণ্ডল
(তেলেভাজার দোকান)

৪০ বছরের দোকান, আগে আমার বাবা চালাতেন। এখন আমিই চালাই। বিক্রি মোটামুটি ওই একই রকম হচ্ছে। লকডাউনের পর বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে নি। আগের মতই লোকজন আসছে দোকানে।

কিশোর মন্ডল (চায়ের দোকান)

১৭-১৮ বছরের দোকান। লকডাউনের আগের চেয়ে ব্যবসার ভলিউমটা এখন অনেক কমে গেছে। আগে দিনে ৫০০০ হাজার টাকার ওপর বিক্রি হত। এখন সেলটা অনেক কমে গেছে। লকডাউনের সময় মালপত্র ডিস্ট্রিবিউটরের ঘর থেকে আনতে হচ্ছিল। এখন তাও কিছু কিছু জিনিস এসে দিয়ে যাচ্ছে। সামনে পুজো, লোকজন টাকা বাঁচিয়ে কেনাকাটা করছে। আগে ডিমনিটাইজেশনের সময় খানিক বিক্রি কমেছিল। তবে এবার তার চেয়েও খারাপ অবস্থা!

বাণেশ্বর সামন্ত (ষ্টেশনারী দোকান)

আমার প্রায় ১৬ বছরের দোকান। আইস্ক্রিম, প্যাটিস, পেস্ট্রি এসব বিক্রি করি। বছর দশেক আগে যখন পাড়ায় প্রথম 'মিও আমোরে'-র আউটলেট খোলে, তখন ব্যবসা খুব মার খাচ্ছিল। তারপর আবার সামলেও গেছিল। লকডাউনে দোকান পুরোপুরি বন্ধ ছিল। খুব অর্থকষ্টে পড়তে হয় নি, অসুবিধা হয়নি, কারণ বাড়িভাড়া থেকে আয় আছে কিছু। তা দিয়েই সাংসারিক খরচ-পাতি মোটামুটি চলে গেছে। লকডাউন ওঠার পর প্রথম এক সপ্তাহ প্রচুর খরিদ্দার ছিল। তারপর এখন কমে গেছে।

প্রসূন মণ্ডল (আইস্ক্রিম পার্লার)

আমার এই দোকান দশ বছরের। মূলত অন-ডিমান্ড জিনিসপত্র এনে দিই। লকডাউনের সেরকম কোনো এফেক্ট হয় নি, অ্যাভারেজ যেরম বিক্রি হত আগে, তা-ই হচ্ছে। পার্টস পাওয়া যাচ্ছে, তবে দামটা একটু বেড়েছে। আরও এখন এই 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম', 'অনলাইন ক্লাস' – এসবের জন্য দরকার পড়ছে এসব জিনিসের।

ভাস্কর দাস
(ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান)

আমাদের এই কোম্পানির বয়েস বছর দুয়েক। দুজন শরিক আছি – আমি আর সুরজ আচার্য। আমি বছর দেড়েক হল আছি। লকডাউনের আগে কাজের রেসপন্স খুব ভালো ছিল। মার্চের শুরুতেও কাজ করেছি। ডিসেম্বর থেকে টানা কাজ চলছিলই। শুধু তো ইভেন্টের ছবি তোলা নয়, প্যাকেজ হিসেবে কাজ চলে আমাদের। এই যেমন আগামী বছরের কিছু কাজের বুকিং এখনই হয়ে গেছে। আনলক শুরু হওয়ার পর কাজ শুরুর সুযোগ থাকলেও, মানুষের মনে আতঙ্কের কারণে কাজ পিছিয়েছে। লকডাউনের আগে বিজনেসের গ্রাফটা বাড়ছিল। তারপর সব বন্ধ। শুধুমাত্র সেভিংস থেকে চলেছে অনেকগুলো দিন। আমাদের চেনা একটা সংস্থা যেমন বন্ধই হয়ে গেছে। ওয়েডিং প্ল্যানার বিষয়টা উত্তর কলকাতার দিকে অতটা প্রচলিত নয় আসলে। আমরা ঠিক করেছি, পরবর্তী ইভেন্টের সময় প্যারামেডিক্যাল স্টাফ থাকবে। স্যানিটাইজার, মাস্কের পাশাপাশি কেউ অসুস্থ হলে তার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা রাখা হবে।

অভিষেক সানি (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ওয়েডিং ম্যানেজমেন্ট)

পুরো হোটেল ইনডাস্ট্রিটা দু'টো ভাগে বিভক্ত। একটা হল 'রুম ডিভিসন' আর একটা হল 'ফুড সেক্টর'। ৫ থেকে ৬ মাস আগে অবধিও সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু এই প্যানডেমিকের ফলে সবটা থেমে গেছে। ম্যাক্সিমাম প্রভাব পড়েছে এই ফুড সেক্টরের ওপর। হোটেলগুলোতে যেখানে আগে লোকাল মানুষজন এবং বিদেশ থেকে বিভিন্ন লোকজন আসত, সেখানে এখন প্রায় কেউই আসছে না, আর অনেক হোটেলকেই তাই বাধ্য হয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারও হতে হয়েছে। শুধু তাই না, অনেক বড় বড় হোটেলও সারভাইভালের জন্য কেটারিং সার্ভিস চালু করেছে। সবটা নর্মালে আসতে ১ থেকে ১.৫ বছর তো লাগবেই।

শৈবাল মুখার্জি
(হোটেলিয়র)

দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমার এই ভ্রমণযাত্রার ব্যবসা। মার্চ মাসের পর থেকে অবস্থা খুব খারাপ। অনেক টাকা অনেক জায়গায় আটকে আছে। বুকিং সব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবটা পুরো থমকে গেছে। কবে সবটা নর্মাল হবে, কিছুই বলা যাচ্ছে না।

দেবদূত রায় (ট্রাভেল এজেন্সি)

আগের থেকে প্রায় ৫০% আয় কমে গেছে। যারা রেগুলার কাস্টমার ছিলেন, তাঁরাও এখন আসছেন না, ভয় পাচ্ছেন। আগে দিনে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জন কাস্টমার হলে সেখানে এখন খুব বেশি হলে ৫ থেকে ১০ জনের বেশি হচ্ছে না।

সম্রাট মুখার্জি (ফাস্ট ফুড সেন্টার)

লকডাউনের সময় খুবই খারাপ অবস্থা ছিল। তবে এখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে আবার। তবে কতটা স্বাভাবিক হচ্ছে বলতে পারব না। প্রায় ৩ মাস বন্ধ থাকায় বাড়িতে যেটুকু যা জমানো ছিল, সবই প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। নতুন করে ইনভেস্ট করার মত সামর্থ্য নেই এখনো। এইভাবেই কেটে যাচ্ছে কোনোরকমে।

অভিষেক হাওলাদার (কসমেটিক্স বিক্রেতা)

গত ৩ বছর ধরে ফুল বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছিলাম। স্বামী মারা যাওয়ার পরই এই ফুল বিক্রির দোকান খুলেছি। মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এই লকডাউনে মানুষ প্রায় ফুল কেনা বন্ধই করে দিয়েছেন, যার জন্য ৩টে বাচ্চাকে নিয়ে পেরে উঠছিলাম না। তাই এখন বাধ্য হয়ে সবজি বিক্রি করছি। এখনো যথেষ্ট কষ্টের মধ্যেই চালাতে হচ্ছে।

মীরা বেরা (ফুল/সবজি বিক্রেতা)

প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর ধরে এই পেশায় রয়েছি, এইরকম ভয়ংকর অর্থের টানাটানির মুখোমুখি কখনো হই নি। এখন এমনই অবস্থা, যে দু-বেলা খাওয়া পর্যন্ত জুটছে না সব দিন।

নীতিন গুপ্তা (ফুচকা বিক্রেতা)

আগে ব্যবসা বেশ ভালই ছিল। এখন অনেকটাই কমে গেছে। আগে যেমন স্কুল-কলেজ খোলা থাকলে বেশ ভালই চলত, এখন প্রতিদিনের আয় আগের চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে। নতুন জিনিসের দাম অনেক বেড়ে গেছে, কাজেই কাস্টমারদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিস আনতে পারছি না।

তপন হালদার (রকমারি দোকান)

আমি প্রায় ১০-১১ বছর ধরে এখানেই দোকান দিয়ে আসছি। আগে চা-এর দোকান ছিল। এখন সেটাকেই এসব ছোট ছোট জিনিসের দোকানে বদলে ফেলেছি। লকডাউনের আগে অবধি ঠিকঠাকই চলছিল ব্যবসা। এখন বাজারের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। মাঝে মাঝেই এমন হয়, যে গোটা দিনই ফাঁকা বসে কাটাতে হচ্ছে।

বুচি দাস (হকার)

আগে তিনটে বাড়িতে কাজ করে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু লকডাউনের সময় আমায় দুটো বাড়ি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ৩টে বাচ্চা নিয়ে এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে একবেলাও ঠিক করে খাওয়া জুটতো না। এখন আরো একটা বাড়িতে কাজ নিয়েছি। মোট দুটো বাড়ি কাজ করি, তাও খুবই অর্থকষ্টে আছি।

খুকুমণি বেরা (গৃহকর্মী)

সব দোকানই প্রায় খুলে গেলেও বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। কাস্টমার নেই। ইনকাম বলতে গেলে হচ্ছেই না। সেই সকাল থেকে দোকান খুলে বসে থাকি, কিন্তু প্রায় কোনোদিনই লাভের মুখ দেখতে পাই না। এরকম দিন দেখতে হবে কখনোই আশা করি নি।

নিমাই দত্ত (সিডি-ডিভিডি বিক্রেতা)

লকডাউনের সময়টার তুলনায় এখন ব্যবসার অবস্থা অনেকটাই ভাল হয়েছে। তবে আগে দিনে যা ব্যবসা হত, তার ৩০ শতাংশের বেশি হচ্ছে না এখনও। কাস্টমাররাও ভয় পাচ্ছে, আর কিছু ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও ভয় পাচ্ছি যেতে।

সোমা হালদার (বিউটিশিয়ান)

"…the moment you think it to be your own, you will definitely win the race"

Mr PM Chandraiah is presently the Managing Director of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. The Kolkata based PSU which was performing extremely poorly and was on the verge of shutdown saw magic after charges were handed over to Chandraiah. What is the secret strategy? Team Elixir explores.

Bengal Chemicals has always been a historical milestone. Before proceeding further, if you could kindly say a few words regarding the history of this organisation.

Exactly. This organisation is not only the pride of Bengal but also the pride of India. This is regarded as the heartbeat of India. The rich heritage inspires us every day to work for not only the better but the best.

At present is there one product of your company which is most widely accepted?

Mostly the 'Black Pheneol' of Bengal Chemicals is widely accepted. This has also helped in an increase of production like anything. Previously whatever production used to be happen in a year has now become the production over six months. There is a huge demand for Pheneol all over India. This product is very effective.

Due to the lockdown, the industrial sector had collapsed. So, how has the management succeeded in running this organisation during the period?

The Pharmaceutical industry or to be more specific, Bengal Chemicals, is exempted from the lockdown. And moreover, we are selling our products only to the Government and to the Government Departments. The OPD has stopped due to Covid. There is a shortfall in the Pharmaceutical products. So, the maximum product which could be produced is Pheneol. Regarding this, I have transferred around fifty factory emoloyees from Maniktala Factory to Panihati Factory. We are running both first and second shifts. To meet the regular demand the production has increased from 15,000 bottles per day to nearly 50,000 bottles per day. We have also taken care of the health and safety of our workforce who are working in BCPL.

BCPL is such an age-old Pharmaceutical company. But in the past few decades it was running into losses. After you stepped in, the dry company turned out to be a profitable one and also made a huge turnover. What are your future plans regarding this?

It has happened as a result of togetherness and belongingness. If you work thinking it to be your own organisation, no company will ever run into losses. In any field whether it is

education, driving or anything, the moment you think it to be your own, you will definitely win the race. No matter in which organisation you are working, you need to be definite and hardworking, then there will be no damage. Earlier there was lack of discipline here. The system or the organised part was not there. So, I had to work on developing these factors. Transparency and confidence, both was lacking in some cases which was taken care of. There is problem in public sectors. Long term vision and long term leadership is also lacking. A Director comes for a period of two to three years. The vision will also be for a short term. If PSUs get long term visionary leaders, definitely no PSUs will run in losses.

Recently BCPL has created history by doing the highest production of all times in a single day. What are your views regarding this?

It is not a story of a single day. Every day we are creating history. Everyone is doing a wonderful job in the BCPL. This is the first time in the 120 years of history of BCPL that in the month of August, the production turned out to be eight crores in the Panihati Factory. On 23rd of August, 2020, an all-time high production of 51,960 bottles of Pheneol was achieved and 60,680 bottles of Pheneol were produced on 26th of September, 2020. It has not happened because of me or anyone. It was only possible with the immense blessings of P.C. Roy and all our elders.

What is your present and future strategy to run the organisation in order to cater to the needs of people in Bengal as well as the whole of India?

This company was established with the vision of producing chemical, pharmaceutical and cleanliness product. This was the first pharmaceutical company of India. This was done by Acharya P.C. Roy with the motto of serving the people, giving quality medicines at affordable prices. We are working to maintain the quality and to give the best to the society. Few years back it was noticed that BCPL, being a dry company, was not so much in hype in the market. But today there is a huge demand of Pheneol, sanitizers, and all other products. Speaking of Bengal, the population here is very much attached to the company from the very beginning.

In my lifetime I have come to know about nearly 200 companies, but this type of heritage and glory is really hard to find. Whatever I am or we are doing for this company is only to maintain and preserve this rich heritage of the company. If I am allowed to continue here then definitely within two years this company will become one of the most profitable and flourishing companies. We will definitely implement 2017 pay scale. It will soon become a Miniratna Company within 2022-2023.

Holding such a respectable post in this company, what are your views regarding this organisation?

Everyone here is working for not only the better but the best. They are working like the soldiers of the company. This has only happened due to everyone's dedication, hard work, and soulful contribution to this company. We all have to keep working and striving towards our highest endeavour.

AROUND THE WORLD

Historiography of Environmental History | Sauro Dasgupta

By History, we mean the study of mankind, region, time, place, institutions and nations, etc. It tells us how people lived and died the prevailing system of social structure and governance, etc. According to the Encyclopaedia Britannica, "**History** is the discipline which studies the chronological record of events (as affecting a nation or people), based on a critical examination of source materials and usually presenting an explanation of their causes."

In course of time, by studying the history, it has been found that it had several segments in the context of which a critical study of History is possible and very much imperatively so. As such, out of several segments, the most important is a critical understanding of Environmental History, which refers to history in the context of various environmental events and structures.

In 1967,Dr Roderick Nash, who is now professoremeritus of History and Environmental Studies at the University of California Santa Barbara, wrote a seminal text titled,*Wilderness and the American Mind* (1967), that was published by Yale University Press, a work that became a classic and a pioneer on the study of environmental history. In his speech at the *Organization of American Historians* in 1969, he used the term 'environmental history' for the first time. In that respect, he may be called the Father of Environmental History, which has immense scope for exploration.

Environmental history promoted a moral and political agenda of some liberal scholars and it took time to become a discipline that later attracted intellectuals from all sides of the political spectrum. Early attempts to define the subject and perform groundbreaking research on the same were made in the United States of America by Dr Roderick Nash in his *magnum opus Wilderness and the American Mind (1967)*, and in other writings of Environmental historians like Dr Frederick Jackson Turner, Dr Radha Kamal Mukherjee, Dr James Malin, Dr Walter Prescott Webb, Dr Surajit Chandra Sinha, who elucidated the process of human settlement in nature, the overtaking of nature and dominance over the same by the human beings with the help of sheer strength and will power. Their work was well received and improved by a second generation of specialized environmental historians and nature conservation activists such as , Dr Jane Goodal, Dr Jeffrey Sachs, Dr Joseph Nye, Al Gore, Noam Chomsky, Carolyn Merchant, Dr J. R. McNeill, Donald Hughes, Dr Jordan Brett Peterson and Chad Montrie in North America, SlavojŽižek, Annie Besant, Dr Michael Redclift, Dr Woolfgang Sachs, Paul Warde, Dr Christophe Jaffrelot, Sverker Sorlin, Robert A. Lambert and Peter Coates in Europe, Dr Vandana Shiva, Dr Ramachandra Guha, Dr Madhav Gadgil, Prof Ranjan Chakrabarti, Dr Mahua Sarkar, Prof MaroonaMurmu, Dr Iftekhar Iqbal, Arundhati Roy, Aruna Roy, Sanjib (Bunker) Roy, Sanjib Baruah, Dr Subhasis Biswas, Medha Patkar, A David, Dr Liu Ts'ui-jung in Asia, etc.

Environmental history emerged in the United States out of the environmental movement of the 1960s and 1970s, and much of its impetus still stems from present-day global environmental concerns like climate change, global warming, flooding, deforestation, etc. It was established on issue of conserving nature but it's scope has been broadened to include more general social and scientific history dealing with urban planning, population control, agricultural distress, infrastructural collapse, unsustainable growth that was not attuned to taking care of the environment, and ensuring sustainable development. It's a multi-disciplinary subject, involving Economics, Sociology, Geography, Botany, Biology, Environmental Science, Cultural Studies, Political Economy, Political Science, Geology, Reasoning, Philosophy, Mathematics, etc. The Indus Valley Civilization comprising the archaeology and social status of Harappa and Mohenjo-Daro lent a view of archaeology of the period and the history of the period has its roots in the environment of the region. One can visualise vividly the architectural magnificence of the place. Similarly, the Egyptian Civilization created two of the Seven Wonders of the World, the Great Pyramid at Giza and the Sphinx. The Indus Valley Civilization, the Greek Civilization, and the Egyptian Civilization are the main glaring instances of the study of Environmental History. The components of environmental history can be divided into two main parts:

(i) Natural evolution: The birth of humanity and its growth and development over a period of time in a natural manner, with nature bestowing them strength and core competencies of knowledge, physical and mental prowess, intuition, adaptation, flexibility, and endurance is called natural evolution.

(ii) Social evolution: As men grew stronger and more powerful, they began to exploit nature for their own material needs. Overconsumption led to the problem of finishing the full resource, creating inequalities among the people, thereby leading to resource degeneration, pollution and environmental damage, besides antagonism between the rich and the poor and mutual distrust, misunderstanding and rebellion by the poor against the rich. As a result, the balance of natural development and growth got adversely affected. This state of situation might even lead to a civil war, not at all desired for national growth and development. However, Sir Charles Darwin in his magnum opus, 'The Origin of Species' opined that in this struggle between nature and human beings and among different human beings, the stronger, braver, mightier, the meritocratic, the competent would emerge successful. This is what he termed as 'Survival of the fittest'.

Marxism, which emerged later was anathema to the dominant classes and thereby, all efforts were undertaken to suppress it by the dominant capitalist society. Ironically, Marx spoke about environmental conservation at a time when his opponents were disregarding the environment to industrialise the world.

Environmental historians and nature conservationists like Dr Jane Goodal and Rachel Carson urged the need to care for the animal and birds, nature's endowments like plants, water, air, light from any sort of degradation, pollution, onslaught, man's greed, and exploitative attitude and advocated a strong governmental and non-governmental approach to protect nature. Dr Vandana Shiva introduced the ideas of eco-feminism in the US, which emanated from the Vedic ideals of conservation of nature, worshipping nature as our gods or 'Istadevata', taking care of the plants, animals, not using them for labour or consumption, not torturing them, protecting them with all our might, etc. Her ideas were also inspired by the Bishnoi Movement and the Chipko Movement. In the first case, the Bishnoi tribes of Rajasthan had resisted the felling of the sal tree by the King's troops and the protesting tribes were executed. In the second case, in the 1970s, the villagers of the Garhwali district had embraced the trees and prevented the forest officers from felling them. Led by SunderlalBahugana, Chandi Prasad Bhatt and Gauri Devi, the villagers were ready to die for the preservation of their forests. The government ultimately relented and the project of the sports company who were given the forest land was cancelled. The forest land now firmly belonged to the tribals and there was no question of the government acquiring the land. This is the history of 'Grow more trees and preserve the forestry'.

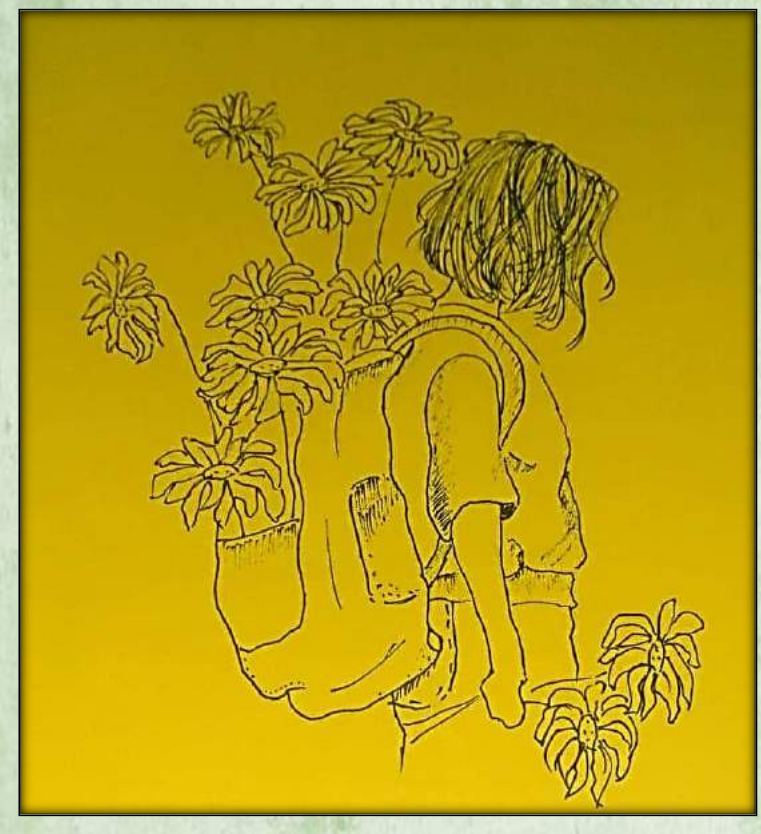

In Ancient India, scholars like Chanakya, Susrata, Kalidas, etc. explained the application of natural products to human lives and how one must preserve the nature to sustain themselves and their future generations. In fact, Acharya Susrata, India's first Ayurvedic practitioner and exponent of modern surgery used Ayurveda for curing human ailments. He prescribed what plant, natural vegetation, bark of the tree, animal hide or crop could be used to cure human diseases. These are organic agents having less reaction than inorganic substances having more reactions, something used by modern physicians to treat human disease. If Ayurvedic ingredients can be used properly, it is claimed that modern surgeries can be avoided. The Vedas and the Puranas mentioned that in the absence of nature, man could not survive. Therefore, we focused a lot on the preservation of nature and

emphasised on community forestry. Ashoka's Dhamma described that all living beings, including plants and animals, were to be safeguarded against any disaster, illness or death.

From the very inception of the Indian freedom struggle to the end of it, while attaining freedom from foreign rule, it had different stages depending on the political, economic, geographical, and social environment. Sometimes, it was aggressive, which can be described as violent and again, it was non-violent and non-cooperative with the rule of the foreign masters. All stages of such chain of events were vibrant with the strong willingness of the Indian nation to come out of the yoke of British imperialism. Such colourful progress of India's struggle for independence brought to the forefrontpersonalities likeMangal Pandey, Rani Laxmi Bai, Tantia Tope, Bahadur Shah Zafar, Khudiram Bose, Prafulla Chaki, Binoy-Badal-Dinesh, Surya Sen, popularly known as Masterda of Chittagong(now in Bangladesh) Armoury Raid and the mastermind of the Indian victory in the Battle of Jallalabad, BaghaJatin, and Jatin Das. We have seen the picturesque life of Subhash Chandra Bose, most popularly known as Netaji, Gandhiji, Pandit Nehru, Abul Kalam Azad, et. al.The upsurge of the movement against the Partition of Bengal may be considered as the golden period in the Indian National Independence struggle. Even a non-political personality like Rabindranath Tagore placed himself at the forefront of the Anti- Partition Movement. Again, what an irony of facts, during the Partition of India, there was no effective movement to stall it. Therefore, it is clear that the history of the Indian freedom struggle progressed in a different kind in different environments. Therefore, that is, also in a way, the chequred Environmental History of India.

Mahatma Gandhi was one of the pioneers of Environmental History in Modern India. In his autobiography *My Experiments with Truth*, he explained many ways how to sanitise our places of worship, how to grow more trees, how to ensure wide-scale afforestation and industrialisation at the same time. He wrote, 'God forbid should India industrialise herself in the same way as in the West'. His adopted daughter, Meera Ben played a major role in his afforestation campaigns. Gandhi's close associate, JP Krishnappa, along with Meera Ben wrote on the disasters of large dams and development projects. Post- Independence, Dr Salim Ali wrote about different species of birds, their migration, food habits, steps to preserve them, etc.

In the US, the publication of Rachel Carson's book, *Silent Spring* (1962) led to the rise of protests throughout America about saving the environment. President Nixon set up the Environment Protection Agency (EPA) to monitor climate change and enable the government to frame National Environmental Policies. Naomi Klein, in her book, *The Shock Therapy* explained that the government, despite intense corporate lobbying, especially by Exxon Mobil to not bring about any substantial change to the prevailing Environmental Policies, had to step in the face of the rising Environmental Movement.

On the contrary, in India, movements like the Bishnoi Movement, the Chipko Movement, the Appiko Movement, the Narmada Bachao Andolan, etc., led to many scholarly publications on Environmentalism and Environmental History. Prominent scholars in this

regard include Dr Ramachandra Guha, Dr Madhav Gadgil,Prof Ranjan Chakrabarti, Dr Mahua Sarkar, etc.

Environmental History can be ramified, studied, extended, and critically studied at present and in time to come. Consequently, the scope of the study of Environmental History and the perception of the same is immense. In course of time, students of History and the scholars must devote unflinching quest to explore more and more of the subject, Environmental History. The scope of research is phenomenal. The more and more we will proceed to explore the different avenues of this discipline, the more we will get astonished and fascinated. The study of Environmental History, in one word, is overwhelmingly amazing.

References:

1. My Experiments with Truth
Mahatma Gandhi
Navajivan Press

2. Wilderness and the American Mind
Dr Roderick Nash
Yale University Press

3. Environmentalism: A Global History
Ramachandra Guha
Penguin Books India Private Limited

Illustration: Ananya Laha

Freedom of NEP at Ground Zero | Swetlina Mitra

The New Education Policy (NEP), 2020 attracted loads of attention from media and academics all over the country. For those who are missing a beat, Draft NEP is a new amendment of the education policies, the last one being made in 1992. The first came in 1968 and the second in 1986, under the tenure of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi respectively; the NEP of 1986 was revised in 1992 when P V Narasimha Rao was the Prime Minister. The third is the NEP released in 2020 under the Prime Ministership of Narendra Modi. A lot of points were presented in the draft; industry-specific training, focus on hand-on sessions than theoretical knowledge, teaching kids in their mother tongue until the age of 5, 5+3+3+4 as against the 10+2 structure, more diverse and flexible college courses as far as degrees are concerned, to mention a few.

Media was flooded with praises; college students wished to have such a system earlier; academicians all across the country applauded the step. To a very reasonable extent, it seemed to be a fair decision. Many said that it would be difficult to implement, and I can understand why. The point which gained the most popularity was that there would be no subject barrier as far as the choice of courses is concerned. In simple terms, a student could take up computer and literature as majors which was not possible earlier. While listening to the reporter, I asked myself a question: Even with all the freedom that NEP has granted, would the students really be able to take up subjects that they desire?

Laws made by the centre do not define reality in Ground 0. It is the society that we dwell in, our homes, our parents that we live with that largely influence our choices. The students probably, would not be given the liberty to choose their subjects. Will a 9th grader be allowed to choose Literature and Computer Science as majors because she wants to? Or would her parents tell her that such a career does not exist, and instead would fill up PCMB? Is our society eligible to encourage people to become a programmer to translate novels into different languages? Or would we still be running after meaningless nine-to-five jobs in corporate sectors?

Think about it. The war of Science and Humanities is going on since time immemorial. Science, in India, is not a stream that students choose. It is a stream they earn. Humanities and Commerce are sections for those who did not prove their worth. Engineering and

Medical, as the only career options, are direly instilled in students. No one told me that I could become a playback singer even though I have been pursuing music since the age of 5. Instead, we are all told to be happy with the choices made *for* us. How long before we finally realise that stable life comes from the passion for the work and not coerced interests? All that a kid becomes depends on that one choice, made on that one day, by the parents who think they know the best, not realising that their decision is based on incomplete knowledge.

My concern is not with the law. Not with this one, at least. My concern is with the factors that define the choices of the student. We reason that a 9th grader may not know what to choose and relies on her parents to choose for her. Accepted. But I am sure she is mature enough to say what subjects she is interested in. Conduct extensive career counselling sessions for both parents and students in schools before making a decision. Help the students identify the prospects in their desired fields. Conduct activities and exams to assess them, which by the way, is the only thing that our current education system specialises in. Bring in experts to conduct orientations on specific subjects and professions. Identify what a student is good at, and only then, make an informed choice. After all, schools and colleges should be something more than just business ventures, right?

The music that you listen to is tuned by someone who has equal prowess in both music and computers. They do cash in a lot. Your computer textbook is written by a person who has an in-depth knowledge of Computer Science and loves to write. Astrophotography is a promising field requiring both system handling and photography skills. Speaking of government jobs, ASI is in dire need of people who have an in-depth know-how of handling codes on computers to process information and also know detailed history. Discovery Channel and hosts of other shows require writers who love working on technical stuff. They earn more than any corporate employee and roam the world on the company's payroll. I agree, not all become Sundar Pichai and Mark Zuckerberg, but the journey doesn't have to be futile when they don't lead to what the society has deemed to be the Everest. A career is made out of knowledge and passion for the work. Robots work on command. As a human, I believe we can do a notch better.

The stereotypical thought process, as far as career is concerned, has changed for the better over the years. People are making good progress in very unique fields in their unique ways and parents are being expressively supportive about it. I can completely agree that "The Road Not Taken" could be long and tough. The point is that just for the sake of having a stable life, we cannot judge both a fish and a bird by their ability to swim. They both are very good at what they do. The law can be changed but the society has to rationalise, evolve, and understand to nurture the future of the country providing scope for holistic development of the students in the truest sense of the term.

"Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action;
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."

Illustration: Google Images

Online Education: Possibility vs Reality | Partha Nandi

In the COVID times, we are very much familiar with the word "online education." Firstly, I denote that it is not a new word. Still, online education started its journey in platforms like YouTube, Unacademy, etc., from 2017, when the 4G internet service became accessible to most people. It gained a massive concern from all over the world during the lockdown period. Many intellectuals started to think that:Online Education is a better substitute for the classroom education system during the pandemic and post-pandemic situation. If we examine the sentence, we see the word "substitute." What is the meaning of "substitute"? "Substitute" means an alternative or a replacement. We think about alternatives when our basic needs are not fulfilled. During COVID times, we cannot avail of the physical classroom anyhow, so we choose online education. It does not mean that online education occupies the position of classroom education. It cannot be possible because an alternative can never be the same as the root or the original.

We all know that India is a developing country. Statistics show that only 50 percent of people avail of the online service in India. In a country like India, where the Government takes various steps like the Mid-day meal system and Sarva Shiksha Abhiyan, to reduce the dropout rates in India, spreading education through the online mode seems to be a nightmare. In the country of 130 crores, it is impossible to think that the Government will provide door-to-door service of smartphone and internet connection for education. The Right to Education Act states the provision of free and compulsory education for children aged between 6-14 years. Still, after the massive implementation of online education during the lockdown period, we see that students have been divide into two groups: One group, i.e., higher section, who can afford the online classesand another group, i.e., economically weaker section, who cannot. So, the polarization of education happens. In our education system, we read about eliminating inequality between the rich and the poor, but this online education system itself increases the difference between the rich and the poor. We see many prominent universities and educational institutions that have started their classes online, which is leading a large section of peopleto being deprived of education. Namitha Narayan, a 5th-semester B.A. student from Kerela, has to climb onto the rooftop of her house to attend her online classes due poor internet connectivity.

She is a symbol of how much we have progressed to meet the goals of online education. If we compare with developed countries like America, Russia, etc., for implementing online education, it is nothing but trash. The story of a milkman may further shock us. Kuldeep Kumar, a Himachal Pradesh milkman, sold his cow to buy a smartphone for his children to study online.

We cannot deprive poor people who cannot afford the online service. The people can suffer in such socio-economic conditions if we accept online education as a default method. Now let us discuss the issue of mental health. A classroom doesn't just teach us; we also learn discipline, responsibility, social interaction, the ability to blend in with the society, teacher-student relations, and much more, which cannot be possible if we open a laptop in our room to study online. Social interaction is essential for our mental health; we already have thousands of followers on social media like Instagram or Facebook, but in real life, we are lonely. We will have to face more suicidal cases in our society. It brings forth a wrong message for our upcoming generation.

Along with mental health, devices like Laptop or mobile phones leave a dangerous physical impact through radiation, ultimately proving fatal for a child in the long run. It creeps on us so silently that we do not know its harmful effect on our life. A recent study shows that intense wireless communication has raised concern over human health, increasing brain tumours due to increase in use of wireless phones, with higher exposure on one side of the brain, whereas the contralateral side is exposed less.

Online education is not a proper solution to bring knowledge to every child in India. Some people think that online education is the only future of education. From ground reality, it is not possible anymore. It may be an alternative or substitute for these situations temporarily. We cannot grant it as permanent.

Illustration: Partha Nandi

বাংলা

অর্ধাঙ্গিনী | দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী

ক্লান্ত শহর, চাদর ঘিরে ঘুমের কোলাজ বোনা
সময় চলে আকাশ পথে, ঘড়ির অবসরে
নষ্ট হওয়া আলোর নীচে রংমিলান্তি বাতিল;
পোস্টবক্সের সব ঠিকানাই শ্রান্ত হয়ে পড়ে।

অন্ধকারের নাগরিকতায় নারাজ প্রজাপতি।
অচেনা পথে দিকভ্রান্তির জমাট ঘন কালো,
জোনাকিরা সেইখানে যায় পথের বাড়ির খোঁজে;
সেই ঠিকানায় ওদের ছোঁয়ায় জ্বলবে শীতল আলো।

মেঘবালিকা, নীরা সবার ঘুমপাড়ানির পরে
যে শহরে রাতের বেলা সব যোগাযোগ মৃত -
মিথ্যাচারের রক্তপাতে কলমদানি সাজে
কথোপকথন চলে নেহাত ব্যবহারজনিত।

শহর খুঁজে তবুও যদি সেই জোনাকি আনি,
জেনো আজও খরস্রোতা, স্রোতের অর্ধাঙ্গিনী।

Illustration – Ipsita Sardar

একটা সংসারের খোঁজে | প্রকাশ বাড়ৈ

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই শিয়ালদহ স্টেশনে লোকজনের ভিড় তুলনামূলক বেশি চোখে পড়ে, খালি কালো কালো মাথা দেখা যায়। চারিদিকে লোকজন ছোটাছুটি করছে, ঠেলাগাড়ি করে মালপত্র সরানো হচ্ছে, গেটের মুখে দু-চারজন টিটি দাঁড়িয়ে আছে; 'ফাইন' নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে। প্রায় রোজই এরকম একটা দৃশ্য দেখা যায়।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখটা ভার, দুপুরের দিকে এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। এখন আকাশটা গুমোট বেঁধে আছে, যে কোনো মুহূর্তে আবার মুষলধারে নামতে পারে। ব্যাগ থেকে ছাতাটা বের করে হাতে নেয় অয়ন, ৫:৫০-এর 'কল্যানী সীমান্ত'-টা ধরতেই হবে। জোর কদমে পা বাড়ায় অয়ন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না, বলতে বলতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল! সে যতই ছাতা থাক, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি নামলে কোন ছাতাই কাজে আসেনা। তাই এক প্রকার কাকভেজা হয়ে কোনোমতে স্টেশনে ঢুকল সে। যথারীতি ট্রেন আগেই ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়ে দিয়েছে, লোক গিজগিজ করছে। কোন দরজা দিয়ে উঠবে ভাবতে ভাবতে একেবারে শেষমাথা অবধি চলে গিয়েও একটু ফাঁকা কামরা খুঁজে পাওয়া গেল না। এমনিতেই অফিস টাইম, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের একাধিপত্য, এসব সাতপাঁচ ভেবে মাঝামাঝি দেখে একটা কামরায় উঠল অয়ন।

- দাদা একটু চেপে যান, ভিতরে লাইনে ঢুকে যাই।

- কোথায় লাইনে ঢুকবেন মশাই? দেখতে পাচ্ছেন না সূচ ফেলার জায়গা নেই। ফাঁকা হোক, তারপর ঢুকবেন। গেট-টা ছেড়ে দাঁড়ান, নাহলে দমদমে লোকে ঠেলে নামিয়ে দেবে।

অয়ন আর উচ্চবাচ্য করে না, যদিও সে বেশ কিছু বছর ধরে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করছে, তাও যেন গলা চড়িয়ে দু'টো কথা বলার খুব একটা সাহস হয় না। যদিও ভদ্রলোক ভুল কিছু বলেন নি। এমনিতেই জৈষ্ঠ্য মাসের আম কাঁঠাল পাকার গরম, খানিকটা অনুমান করেই নেওয়া যায় কি ভয়ঙ্কর রকমের ভ্যাপসা গরম তৈরী হয় ট্রেনের ভিতরে। ঘড়ির কাঁটায় ৫:৫০ বাজতেই ট্রেন ছেড়ে দেয়, অথচ দরজা কিম্বা জানলা দিয়ে বিন্দু মাত্র হাওয়া ঢোকার জো নেই। পকেট থেকে রুমালটা বার করার চেষ্টা করে অয়ন কিন্তু পকেটে হাত গলানোর সুযোগটুকু নেই। বিধাননগরে ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হয় রোজকার বচসা।

- দাদা আপনি আমার পায়ে পা রাখলেন কেন?

- আমি কি আর ইচ্ছা করে রেখেছি?

- ও দাদা ব্যালেন্স রাখুন। গায়ের উপর ঢলে পড়ছেন যে।

- এবার আপনিও ঢলে পড়ুন আমার গায়ে তাহলেই তো শোধবোধ হয়ে যায়।

এসব কথা পরে বাড়ি বসে খোশমেজাজে মনে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হাসি কিম্বা কান্না কোনটাই আসেনা।

নৈহাটিতে ট্রেন বেশ হালকা হয়ে যায়। জানলা দরজা দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া ঢুকছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। বিকালের বৃষ্টি বেশ অনেক জায়গাতেই হয়েছে। হাওয়া অন্যান্য দিনের তুলনায় ঠাণ্ডা, শীতল হাওয়ার সংস্পর্শে এসে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীরটা একটু স্বস্তি পায়। অয়নের বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে।

কলেজস্ট্রীটে এক নামকরা পাবলিশিং হাউসে কাজ করে। সংসার বলতে সে একাই, বাবা মারা গেছেন সেই ছোটবেলায়,আর মা-ও গত হয়েছেন বেশ কিছু বছর হলো। যতদিন মা ছিল ততদিন এদিক ওদিক করে মা-ই পড়াশোনা চালিয়েছে। ফার্স্ট ইয়ারে ওঠার পর পরই মায়ের হঠাৎ করেই কিডনি ড্যামেজ হয়ে পরে। সপ্তাহে সপ্তাহে ডায়ালিসিসের খরচ, নিজেদের খাওয়ার খরচ, এই সবের তাগিদে তাকে পড়াশোনার পাট চোকাতে হয়। বেরিয়ে আসতে হয় কাজের খোঁজে। অবশ্য বর্তমান যুগে খুব মন দিয়ে ডাকলে হয়তো ভগবানকেও পাওয়া যায়, কিন্তু একটা চাকরি পাওয়া যায় না। তাও একে ওকে ধরে এই পাবলিশিং হাউসে একটা অস্থায়ী কাজ কোন ভাবে জুটে গেছিল। অবশ্য এতে পেটের ভাত, মায়ের ওষুধ ভালোভাবে চলে যাচ্ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত আর মাকে বাঁচাতে পারেনি। এখন সে একাই থাকে। যা উপার্জন করে, একজন মানুষের দিব্যি হেসেখেলে চলে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেই রান্নাবান্না করে খেয়ে দেয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। বিকালে বাড়ি ফিরে কোনোদিন সকালের ঠাণ্ডা খাবার খায় আর তা নাহলে মুড়ি কলা

বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়ে। মন ভালো-খারাপের একমাত্র সঙ্গী সে নিজেই। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাতই সীমিত, ন' মাসে ছ' মাসে একবার দুবার খোঁজ খবর নেয়। হ্যাঁ, তবে পাড়া-প্রতিবেশীরা মন্দ নয়, অসুস্থ হয়ে পড়লে খোঁজ খবর নেয়, খাবারদাবার দিয়ে যায়। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে অয়ন ভীষণভাবে একা। ওই যে দিনের শেষে একটা মানসিক আশ্রয় সবারই দরকার হয়। এই অভাবটা নিদারুণ উপলব্ধি করে অয়ন। অয়নের বেশ মনে আছে যেদিন মা চলে যায় সেদিনও সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল, মা যদিও বারবার করে বলেছিল, "আজ যেতে হবেনা, আমার কাছে থাক একটু", কিন্তু অস্থায়ী চাকরিতে কামাই করলে যে আর কাজ থাকে না! বেরোনোর সময় বলেও গেল অয়ন, "আজ রাতে ফেরার সময় বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসব"। সেদিন খাবার নিয়ে অয়ন এসেছিল ঠিকই কিন্তু খাওয়া আর হয়নি।

ট্রেন কল্যানীর চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। ট্রেন থেকে নেমে গেট দিয়ে বেরোতে না বেরোতেই আবার মুষলধারে বৃষ্টি! কোনোমতে দৌড়ে গিয়ে একটা দোকানের শেডে দাঁড়ায়। দোকানটা বন্ধই থাকে, সাধারণত কুকুরগুলো শুয়ে থাকে ওখানে। “ধুর!! আজকের দিনটাই খারাপ”, বলে ওঠে অয়ন।

- হ্যাঁ, ঠিক বলেছ দাদা।

সাধারণত অয়নের 'হ্যাঁ'-তে 'হ্যাঁ' মেলানোর লোক খুবই কম। খানিকটা অবাক হয়ে দেখে বাচ্চা মেয়েটাকে, সাত কি আট বছর হবে, দু'দিকে দুটো ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা, একটা ছেঁড়া-ফাটা ফ্রক পরা, সারা গায়ে ধুলো ময়লা, কিন্তু চোখে মুখে একটা অদ্ভুত মায়া আছে।

- কী নাম রে তোর?

- চাঁপা। তোমার নাম কি?

- বাহঃ! নামখানা তো সুন্দর। আমার নাম অয়ন। তা এখানে একা একা কি করছিস রাতের বেলায়?

- আমি তো সারাদিন এই স্টেশনেই থাকি, ভিক্ষে করি, এর ওর কাছ থেকে এক-টাকা দু-টাকা করে যা পাই, দিনের শেষে ওই দিয়ে খাবার কিনে বাড়ি যাই।

- কেন? ভিক্ষে করিস কেন পড়াশোনা না করে? বাড়িতে কে আছে? তারা কিছু বলে না?

এত গুলো প্রশ্ন শুনে মেয়েটা অবাক হয়ে যায়। তারপর একে একে উত্তর দেয়।

- দাদা গো! পেটে তো খাবার দিতে হবে! আর মা তো আগে লোকের বাড়ি কাজ করত, তারপর পেটে পাথর ধরা পড়ে, কাজ চলে যায়। ডাক্তার বলেছে অপারেশন করাতে হবে। এমনিতেই পেটের জোগান দিতে নাকানিচোবানি লেগে যায়, আবার অপারেশন!

পরমুহূর্তেই আবার বিজ্ঞের মত উত্তর দেয়, “কিন্তু অপারেশন তো করাতে হবে বলো। এরপরে আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হয়না, তাই ভিক্ষে করি। সারাদিনে যা হয় তা দিয়ে মা-বেটিতে নমো নমো করে চলে যাচ্ছে।”

- আর তোর বাবা??

- তাকে তো চোখেই দেখি নি।

অয়নের চোখের সামনে নিজের জীবনের ছবি ফুটে ওঠে, মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। চোখের কোণটা চিকচিক করে ওঠে। বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে।

- তোর বাড়ি কোথায় রে?

উল্টো দিকে হাত দেখিয়ে চাঁপা বলে ওঠে, “ওই যে রেললাইনের ওদিকে যে ঝুপড়িগুলো আছে না? ওর মধ্যে একটাতে আমরা থাকি।”

- কি খেয়েছিস সারাদিনে?

- পাঁউরুটি আর কলা।

খাওয়ার কথা বলতেই অয়নের মনে পড়ে যে তাকেও রাতের খাবার খেতে হবে, কিন্তু আজ কেন যেন আর ইচ্ছে নেই, তাই চাঁপাকে উদ্দেশ্য করে বলল, “চাউমিন খাবি?”

চাঁপা একটু অবাক হয়ে গেল প্রথমে, সচরাচর এমন করে তো কেউ বলেনা। তারপর বলল, “হ্যাঁ খাব, কিন্তু...”

- আচ্ছা আয় আমার সাথে।

স্টেশন লাগোয়া 'দাস রোল সেন্টার' তখনও খোলা আছে। চটপট গিয়ে অর্ডার দেয় অয়ন, “দাদা, তিন প্যাকেট চিকেন চাউ প্যাক করে দিন তো।” চাঁপার মাথায় ঢোকেনা তিন প্যাকেট দিয়ে কি হবে।

তারপর প্যাকেটগুলো চাঁপার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "চল, আজ তোর বাড়ি যাব। তারপর সবাই মিলে খাব"।

চাঁপার বাড়িতে আজ পর্যন্ত কোন অতিথি আসেনি, কিন্তু আজ আসবে। সে বহুবার দেখেছে স্টেশনে কত শত লোক নামে, তাদের নিতে লোকজন আসে, আবার আত্মীয়কুটুমদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে টাটা দিতেও সে বহুবার দেখেছে। কিন্তু তার বাড়িতে আজ কেউ প্রথম বার যাবে। একটা হাসির রেখা তার ঠোঁটে খেলে যায়। সে বলে ওঠে, “সত্যি বলছ দাদা!!”

- হ্যাঁ রে।

টিনের একটা ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা, চাঁপার মা দরজা খুলে প্রথমে একটু অবাক হয়। চাঁপা তাকে সব বুঝিয়ে বলায় সে কিছুটা বোঝে আর তাছাড়া অয়নের চোখে মুখে একটা নিষ্পাপ ভাব আছে, অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। সেই মুহূর্তেই অয়ন বলে উঠে, “মাসিমা কেমন আছেন? শরীরের অবস্থা কেমন আপনার"?

এরকম ভাবে আজ পর্যন্ত ক'জন খোঁজ নিয়েছে চাঁপার মা মনে হয় গুনে বলতে পারবে। চাঁপার মা বলে, "যাও বাবা, হাত পা ধুয়ে নাও"। অয়নের তখন মায়ের কথা মনে পড়ে যায়, তার মা-ও এভাবে বলত। তারপর তিনজন মিলে রাতের খাবার শুরু করে, যেন সপরিবারে একসাথে খেতে বসেছে, তৃপ্তি করে খায় ওরা। চাঁপার মায়ের মুখের প্রসন্নতা অয়নের চোখ এড়াতে পারে নি। তার মনে পড়ে যায়, হয়ত সেই বৃষ্টির দিনে মা অমন করে চলে না-ই যেতে পারত, বরং সেদিন রাতে মা-ছেলে মিলে গল্প করতে করতে ডিনার সেরে মায়ের কোলে কিছুটা সময় কাটাতো সে! বিধাতা বোধহয় এমনটা চান নি। তা নাহলে ছোট্ট সংসারটা এভাবে উজাড় হতো না। অয়নের মনের মধ্যে তখন অনেক কিছু চলছে, অনেক কিছু ভাবছে সে।খাওয়া দাওয়া শেষে হাত ধুয়ে সে চাঁপার মা-র কাছে গিয়ে তার হাত দু'টো ধরে বলে, “মাসিমা একটা অনুরোধ করব রাখবেন?”

চাঁপার মা একটু হতচকিত হয়ে পড়ে। তারপর বলে, “কি বলো বাবা?”

- আমার সাথে আমার বাড়ি যাবেন? থাকবেন আমার কাছে? আমার মায়ের মতো? আমার ঘরের কোণগুলো আপনার মমতার স্পর্শে ভরিয়ে দেবেন? আমি আপনার অপারেশন করাব, চাঁপা আমার বোন হয়ে থাকবে, ওকে আর ভিক্ষে করতে হবে না। ওকে আমি স্কুলে ভর্তি করব, অনেক লেখাপড়া শেখাব, চাকরি করবে। ভালো জায়গায় ওর বিয়ে দেব। বিশ্বাস করুন মাসিমা, আমার ওই ঘরে কথা বলার মত একটা প্রাণীও নেই, রাত দুপুরে মন খারাপ হলে দেওয়ালগুলোর সাথে কথা বলি! চলুন না আপনারা আমার সঙ্গে!

বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে অয়ন। চোখের জলে চাঁপার মা-র হাত ভিজে যায়। সেও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিন্তু এও কি সম্ভব? এটা কি বলছে ছেলেটা! লোকে যদি বলে মা-বেটি মিলে এই ছেলেটার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে! অথচ এই অনুরোধ সে কি ভাবে ফিরিয়ে দেবে?

চাঁপা বিশেষ কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু সে এটা বুঝেছে অয়ন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে বলেছে। তার কেন জানি ইচ্ছেও হচ্ছে যেতে, তাই সে মাকে বলে ওঠে, “ও মা চলো না, চলো না!" দু-জোড়া মায়াভরা চোখের দিকে তাকিয়ে চাঁপার মা, "না, তা হয়না" বলতে গিয়েও বলতে পারে না। অয়ন তক্ষুণি বলে ওঠে, “চাঁপা আর দেরি নয়। চটপট রেডি হয়ে নে, পোঁটলা-পুঁটলি গোটা, আমি টোটো ডেকে আনছি।”

নিমেষের মধ্যেই যেন একটা সংসার জুড়ে যায়। এতক্ষণে আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, মেঘ নেই একফোঁটাও। তারা দেখা যাচ্ছে । শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় অয়নের বাড়িটা বোধহয় একটা নতুন সংসারের অপেক্ষায় বসে আছে...

Illustration – Addrish Basak

ক্লান্ত ধর্ষিতা চেয়েছিল একমুঠো বিশ্রাম | রণবীর পাঁজা

ক্লান্ত ধর্ষিতা চেয়েছিল একমুঠো বিশ্রাম

আসব বলে, চুপিসারে পাশ কাটিয়ে

বাতাসের প্রতিটা কণা গেছিল অমৃতের সন্ধানে

জিভ ঝরে, ঝরে পড়ে লালা মেশানো নারীদেহ

মধুর মত মিষ্ট নাকি করলার তিক্ততা

তবুও ঝরে, ঝরেই পড়ে...

ক্লান্ত ধর্ষিতা চেয়েছিল একমুঠো বিশ্রাম,

চাঁদ ও শুভ্র মেঘের কোমল ভ্রুকুটি এড়িয়ে

শেষমেষ রামধনু এসেছিল জ্বলন্ত কাঠের উপর চেপে...

Illustration – Prodorsita Dhar

একটু ভেবে দেখা যাক | সুজ্জ্বলিতা পাত্র

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তেজোদ্দীপ্ত আলোকজ্যোতি ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে এক নারী অবয়বে। এক অপরূপার আবির্ভাব ঘটছে সমগ্র দেবলোককে রক্ষার প্রয়াসে। দেবগণ নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে তুলছেন মা দুর্গাকে, যার নামের অর্থ 'অজেয়'। অত্যাচারী মহিষাসুরকে দমন করার জন্যে শক্তির উৎসই হলেন মা দুর্গা । দীর্ঘ ১৫ দিন একটানা যুদ্ধের পর বিজয়ী মা দুর্গা রক্ষা করলেন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল - এই ত্রিলোককে। দিকে দিকে ধ্বনিত হলো এক নারীসংগ্রামের জয়গাথা।

সালটা ২০২০। নামেই বিষ। কাজেও তেমনি। মহামারীতে বিপর্যস্ত সমগ্র পৃথিবী। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। করোনা নামক এক অসুরের কবলে আজ সমগ্র মানবজাতি। কয়েক লক্ষ মানুষ এখনও পর্যন্ত জীবন-মরণের ভয়াবহ যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছেন। কেউ হয়তো জিতবেন আর কেউ হয়তো চিরতরে চলে যাবেন এই পার্থিব মোহমায়া ত্যাগ করে। সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষার স্বার্থে আজ মা দুর্গার মত শক্তির বড় প্রয়োজন। হাজার হাজার চিকিৎসক-সেবিকা মাতৃরূপে সেবা করে যাচ্ছেন এইসব মানুষকে। কী কঠিন পরিস্থিতি! হাজার হাজার মানুষ আজ জীবিকাহীন। প্রিয়জনকে হয়তো শেষ দেখাও দেখতে পায়নি অনেকে। কত মাস হয়ে গেল অসুস্থ ভারতবর্ষ নতুন সূর্য দেখতে পায় নি। দেখতে দেখতে মা দুর্গার আসার সময় হয় গেল। প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে উঠলেও মানুষ এখনও পর্যন্ত ফিরতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনে। অন্যবারের মত এবার আর অত লাইট জ্বলছে না শ্রীভূমি-সুরুচির চারপাশে, বাঁশ দিয়ে রাস্তাটাও আর অত ঘেরা নেই, হাতিবাগান-গড়িয়াহাটেও পসার জমছে না ভাল। আসলে এই বিপর্যয় মানুষকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে তার সমস্ত অহংকার। সত্যিই প্রকৃতির কাছে আমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র।আর এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য চাই অফুরান শক্তি। অজেয়া মা দুর্গা হলেন তার উৎস। আমরা তো আসলে শক্তির পূজারী। মা যেমন বধ করেছিলেন অসুরকে আমাদেরও করোনাকে ধ্বংস করতেই হবে। হয়তো এবারের পুজোতে থাকবে না জাঁকজমক, কিন্তু থাকবে নিষ্ঠা। যা মিলিয়ে দেবে আমাদের শক্তি আর আমাদের ইচ্ছেকে। হয়তো মানুষ এই পুজোর পরেই এক নতুন

সকাল, এক রোগমুক্ত পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কে বলতে পারে মায়ের মতই কোনো এক দুর্গা হয়তো রক্ষা করবে মর্ত্যবাসীকে - হয়ে উঠবে অন্ধকার হতে উৎসারিত আলো! তাই সকলকে অনুরোধ, আনন্দের জন্য মানবজাতিকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দেবেন না। একদিনের একটু আনন্দ কেড়ে নিতে পারে হাজার জীবন। উৎসবকে মাতৃশক্তির উৎস হিসেবে দেখুন। এক বছরের সতর্কতা আরো বহুবছরের আনন্দ এনে দেবে। জীবনের ছোটো ছোটো জিনিসে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এটা। তাই আসুন সবাই মিলে করি মায়ের আহ্বানে গেয়ে উঠি, "জাগো শক্তি, জাগো স্বপ্ন, জাগো উমা"...

Illustration – Trina Saha

এই তো আমি | দীপজ্যোতি চৌধুরী

ছন্দ যখন পদ্য লেখে

হাতের উপর হাতটি রেখে

উদ্দামতার ঢেউগুলো সব

আছড়ে পড়ে আমার বুকে আকাশ থেকে

মেঘের ঘাটে নৌকাডুবি

পান্না রুবি মুক্তো হিরে

যাক তলিয়ে কথার ভিড়ে

থোড়াই কেয়ার, নেই তো সে আর আমার আমি

হারিয়ে ফেলি পুড়িয়ে ফেলি

মনখারাপের হদিশ লেখা কাগজটাকে

আমায় তখন শুধুই ডাকে

ছন্দ-পথের অগ্রগামী

স্বাধীনচেতা মুক্তিকামী এই তো আমি ।

সুরের উজান খেলায় মেতে

কানটি পেতে শান্তি খুঁজে

গান শুনেছি দিন গুনেছি

ভুল হিসেবে ভরিয়ে খাতা

শুধরে দেবে কেউ কি আমায় বুঝবে এসে?

মিষ্টি হেসে তোমরা যারা

সঙ্গে ছিলে সঙ্গে আছো

দিনের শেষে ফেরার পথে

যাদের প্রভাব অব্যাহত

মনের ক্ষত দেয় জুড়িয়ে

মিষ্টি হাসি তাদের মুখের

একটু সুখের হদিশ পেলাম

অমুল্য সে, একলা বসে

ভাবনা আসে অন্ধকারের

নির্জনতায় আলোর হদিশ

দিচ্ছে তারাই আনছে জোয়ার

তাদের ধারা মনখারাপের শুকনো খাতে ।

Illustration – Samrajni Karmakar

নিস্তব্ধ কলকাতা | অংশুমান পাল

"অগ্রহায়ণ বিদায় নিলে, হলদেটে গাছের পাতায়

স্বপ্ন ঝরে, মাটির 'পরে, ঠাণ্ডা নামে কলকাতায়।"

একটি শহর যখন দিনের শেষে তার দিনলিপি লিখতে বসে, তখন তা পড়তে লাগে খানিকটা ছোটবেলার সেই রঙিন কাগজ সেঁটে বানানো বহুমুখী এবং খানিক ভজঘট কোলাজ-চিত্রের মতন। শহরের রোজনামচা তো আর সরলরেখা বরাবর চলতে পারে না, কারণ তাতে রয়েছে একাধিক লক্ষ-কোটি চরিত্র এবং তাদের দিনব্যাপী দৌরাত্মের কাহিনী; মহানগরীর নানান অংশে নানান ঘটনার মিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া অসম্পূর্ণ অথচ অনন্য একটি প্রতিকৃতিই এই শহরের প্রকৃত বর্ণনা। পঞ্জিকার লগ্ন বদলানোর সাথে সাথে কোলাজ-চিত্রের আকার বদলায়, বদলায় তার রঙের বাহার। রঙ এই কারণেই, যেহেতু আমাদের অনুভব শক্তির একটি বৃহত্তর অংশ খুব গভীরভাবে নির্ভরশীল ভগবান-প্রদত্ত এই দুটি চোখের ওপর। তবে নয়নগোচর সেই কয়েক'শ হাজার অনুভূতির মধ্যে অনেক সময় হারিয়ে যায় অলক্ষিত আমাদের আরো একটি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা। তার নিজস্ব ভাষায়, স্বকীয় ভঙ্গিমায়, প্রতিনিয়ত আমার শহর আমার সঙ্গে কথা বলে।

একটি শহরের নিজস্ব ভাষার সংজ্ঞা বড়ই কঠিন। চোখে দেখা যায় এমন চিত্রের মধ্য দিয়ে শহরের নিজস্বতার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সেই শহরের বাইরে অন্য কোথাওই বেমানান। উত্তর কলকাতার অন্ধ গলির শেষ সীমানায় রাজনৈতিক দেওয়াল-লিখনের হরফ, খাসনগরী অফিসপাড়াতে দুপুর সাড়ে বারোটার রোদে টাটকা চা এবং ধুম্রপানের ধোঁয়ার মিশ্রণ, অথবা শহরতলিতে বেড়ে ওঠা ঊর্দ্ধমুখী অট্টালিকার বাইরে সকালবেলা খবরের কাগজ

ফেরিওয়ালাদের সাইকেলের পিছনে উপচে-পড়া গতদিনের সমাচার – শহর বদলালে আর কোনও সম্ভাবনা নেই অবিকল এই দৃশ্য আর দেখতে পাওয়ার।

কিন্তু শব্দ? শব্দের জন্ম দেয় মানুষ, যন্ত্র, এবং প্রকৃতি। মানুষের রোজ দিনের জীবনসংগ্রাম, মানুষেরই বানানো যন্ত্রের একঘেয়ে ঘর্ষন, অথবা শহরে প্রকৃতি যেটুকু বাকি রয়েছে তার শব্দ মাত্র – শহরের ঠিকানা যাই হোক, পৃথক এবং নৈর্বক্তিক নিরীক্ষণে এদের মধ্যে বিভেদ পাওয়া যাবে সামান্যই। রাস্তাঘাটে চারচাকাদের বিরামহীন বাকযুদ্ধ থেকে মরসুমের প্রথম বৃষ্টির গর্জন – এরা তো শহর মোটে চেনে না। তবে, কেমন ভাবে হয় এই ভাষার জন্ম?

এই জন্মের বংশপরিচয় ঐকিক নিয়ম মেনে চলে না। একাধিক মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বর যেমন পরিণত হয় বৃহৎ কোলাহলে, যেখানে সকলের আপনার কণ্ঠ একদম সামান্য কিন্তু মিলিত হয়ে তারা শব্দ মাপার যন্ত্রকে হার মানায়, আসলে শহরের শব্দরাও হয়তো তেমন। তারা একা একা সকলেই পৃথক এবং তাদের মধ্যে নেই কোনও শহরকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এলোমেলো অমনযোগের মধ্যে দিয়ে তারা যখন এক হয়, যখন তারা নিজেদের পৃথক উৎপত্তি ভুলে উৎসাহী মিছিলে তরুণ কণ্ঠে টগবগে স্লোগানের মতন সংযুক্ত হয়ে ওঠে, তখন সেই মধুর বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে জন্ম নেয় শহরের নিজের ভাষা!

শহরের এই ভাষা প্রত্যেক মানুষের উপলব্ধিতে একটি করে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে। একে অনুবাদ করতে গেলে তার মধ্যে প্রতিপদে রয়েছে অসম্পূর্ণতার আনন্দ। শিশুদের বেড়ে ওঠার পথে প্রতিটি অভিজ্ঞতা এই ভাষার ঝুলিতে একটি করে নতুন শব্দ যোগ করে দিয়ে যায়; এইভাবে শব্দ কুড়োতে কুড়োতে গড়ে ওঠে শহরের শব্দকোষ। আমাদের পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সময়ের সাথে স্থির থাকে না, তাই প্রজন্ম বদলালে অভিজ্ঞতার ঝুলিও বদলে যায়, এবং তার সাথে সাথেই বদলায় শহরের ভাষা। পুরনো ভাষাতে নতুন শব্দের এই যোগ-বিয়োগ ঘটছে প্রকৃতির নিয়মেই; শব্দের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে তারা ঝরে পড়ে বিস্মৃতির জমিতে।

রাতের কলকাতা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। নৈঃশব্দের মধ্যে লুকোনো অভিব্যক্তি, মানুষের অপ্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়ে এই শহরের নিজের অধরা অব্যক্ত ভাবনা, তারা রাতের নির্জনতার মধ্যে মাথা তোলে, গান গায়, তাদের ছন্দ এবং সুরের সিম্ফনিতে গলা মেলায় অন্ধকার আকাশ। শহরের সাথে এই শব্দহীন যোগাযোগের মাধ্যমে যত কথা বলা সম্ভব, তার অনেকটাই অসম্ভব ইঁট-কাঠ-পাথরের মনুষ্যভাষার ব্যবহারে। শহরের ভাষার সামনে শব্দেরা নেহাতই নিষ্প্রয়োজন!

বছরের সেই কয়েকটা দিন এসে উপস্থিত যখন শহরের ভাষা যেন নিজেই ক্ষণিকের জন্য নিজের নিয়মকানুন সবকিছু আপনিই ওলটপালট করে ফেলে। বছরব্যাপী বাঁধা গতের বাইরে বেরোবার বার্ষিক অজুহাত এসে পড়তে আর ক'দিনের তফাৎ। হৃদয়ের গহনতম অন্তরের কোনও অংশের সাথে যাদের বার্ষিক আত্মীয়তা, ঢাকের অনির্বচনীয় বোল সঙ্গে করে সেই সকল শব্দেরা উপস্থিত হল বলে। তবে, কান পাতলে যেন শুনতে পাই শহরের আর্জি, এবছর না হয় খানিক নিস্তব্ধ থাক আমাদের এই বার্ষিক উদযাপনের খেলা?

Illustration- Birupaksha Roy

ENGLISH

The Goddess' Garland | Naznee Mahtab

One of the blessings of Durga Puja is the abundance of the flower Shiuli during this season. This flower engulfs the pristine nature of the festival in its snow-white framework; its wide-spreading aroma appears to embrace the diversity with which Kolkata celebrates the arrival of Goddess Durga. Dropping down effortlessly from the plant, it seems eager to spread happiness and warmth during the festive season.

Shiuli was Mallika's favourite flower. A flower that reminded her of blessed childhood days, a past unforgotten, a time she craved to go back to. A fifteen-year-old Mallika patiently waited for this season where Shiuli would be easily found lying about in her garden so she could pick them up and make garlands for her youngest friend, Misti. Eight-year old Misti would then roam around the entire colony, showing off her garland like it was the most expensive piece of jewellery that she could ever own. Both Mallika and Misti were unaware of the complications that were to befall in the colony due to the inter-religious nature of their unadulterated friendship.

A new family, the Sens, had recently joined the colony and was quite unaware of the diverse nature of the Durga Puja celebrations that the colony had always revelled in. Like the entirety of the city, the people of the colony made no distinctions with the participation of Muslim families in the arrangement of the festivities. Mallika's family, too, assisted with the

Hindu colony members to make all the necessary arrangements, from the decoration of the 'Pandal' to the making of the 'Prosad'. This year, however, an objection was raised in the Puja committee meeting by the eldest member of the Sen family, Mrs. Sharada Sen –

"We cannot let the Muslims take part in certain ritualistic practices. It will be a sin. I am not asking them to stay away from all celebrations, but some practices need to be kept sacred."

In the past twelve years of the formation of this colony, never had a member raised such an objection. Consequently, it was not favoured by the other members. A brief argument erupted, where one side debated on the diverse nature of the festival, and the other side (led my Mrs. Sharada Sen) described the importance of sanctity. Finally, the leader of the Puja committee asked everyone to cast votes. The result was a majoritarian win on preserving the diversity of the festival, overriding Mrs. Sen's claim on maintaining the sanctity of religious rites.

Preparations for the festivities began with full vigour. The Goddess was welcomed with love and respect by all the colony members. The entire place was filled with music, dance and joy. Everything was going according to schedule when one of the elder members of the colony noticed something unusual tied to the feet of Goddess Durga. In her innocence, Misti had tied the Shiuli garland that Mallika made that day around the feet of the idol, unaware of the fact that Shiuli was not a flower that the Goddess was to be adorned with. As the flower garland was quickly untied from the Goddess's feet, Mrs. Sen enquired into the nature of the supposed 'crime' that Misti had committed. On learning that the garland was made by a Muslim girl, Mrs. Sen could not help but explain how she was right about not including the Muslims into the ritualistic practices- "She does not even know that Goddess Durga is to be adorned in 'Joba' (Hibiscus) flower. Any teenage girl of a Hindu family would have known!"

"But the mistake was made by Misti, not Mallika!" Mr. Mukherjee came to the rescue of the teenager who was extremely embarrassed by the havoc she had mistakenly caused. "Misti tied the garland on the idol's feet, and Misti is a Hindu. So the mistake (if it at all be called so) was also hers. Why are you making a child's mistake the cause of inter-religious discord?"

Mrs.Sen quickly refuted, "It is because Misti is spending too much time with Mallika that she has no idea about her own culture and customs. If only we could preserve the sanctity of religious rites will the future generations learn the importance of these festivals. All that children do nowadays is dance around during Durga Puja!"

Mallika's mother, who had been a silent listener all this while, was extremely angry at the last statement that her new neighbour made. Dragging Mallika away from Misti, she declared, "My daughter will not play with Misti or any other child who might be 'defiled' by her religious beliefs". Unfortunately, Misti's parents were both at their workplace, hence no

one came to the child's defense as she frantically kept crying and apologizing for the mistake she had made.

Other colony members were aggravated by this incident and argued with Mrs.Sen that tying a Shiuli-garland in the Goddess' feet is not as big a problem as Mrs.Sen is arguing it to be. "But don't you see that those flowers were picked by a Muslim girl from her garden!" Mrs.Sen declared loudly, "Our Goddess should be adorned in garlands made by believers, those who respect her. Don't you think I am right?" she addressed her last statement to the priest who did not really understand which side to take at that moment and decided to remain quiet.

This catastrophe left an indelible mark on the religious harmony of the colony as the Muslims refused to participate in the festivities any longer. Nothing that the other colony members said could soothe the wound that the new member had caused. This greatly pleased Mrs.Sen, who now took it under her jurisdiction that everything will now be done by the people who share her religious beliefs.

On the day of Saptami, a wide range of flowers arrived for the decoration of the Pandal. Specially crafted hibiscus garlands were also ordered by Mrs.Sen herself from an online floral company, the owners of which were of her religious inclination (she specifically checked for that). As the trunk loaded with flowers arrived, the labourers started loading them down, the members of the colony were prepared to help them. Noticing the white hat on the head of two labourers, Mr.Banerjee realized that it was a Friday and hence the day of special gathering and prayer for the Muslims. "You both are Muslims, right?" He asked with unnecessary loudness to irk Mrs.Sen, who was standing there to inspect the flowers. "Oh yes, sir", they replied without understanding the reason why they were suddenly inquired about their religious beliefs. "I believe some other Muslim labourers also work for this company." Mr.Banerjee made more unnecessary inquiry, and added, "Especially during the time of Durga Puja, the load must be a lot and hence all hands are on deck, right? I mean all hands irrespective of religion?" He made the last statement with such zeal and vigour that all the colony members working around them froze on the scene to hear their reply. The two workers, still not understanding the nature of this inquiry, nodded in agreement "Yes, sir. Even our wives work hard during this season. They help in the making of the garlands." Mrs.Sen froze in her place and hung her head in embarrassment. After the workers departed, Mr.Banerjee explained to the colony members and more specifically to the ones who needed this explanation the most –

"You cannot separate the festival and its preparations from the people. I hope this colony has realised that it has lost a very precious Durga Puja season due to an unnecessary banter. The beauty of this festival lies at the heart of its multiplicity. Ruining its diversity is ruining the sanctity of the festival."

Away from this commotion, Misti and Mallika had found a way to play together, hiding from the latter's mother, continuing the making of Shiuli garlands. "I will bring you Hibiscus flowers, Mallika di, next time you make me a garland out of those!" Misti said with sweetness. "I prefer Shiuli, Misti. When you grow up, you can make hibiscus garlands for me", added the older among them as the younger one nodded in agreement as she put the freshly made Shiuli garland around her neck.

Illustration – Shreya Bag

Dear Prufrock| Rusa Bhowmik

It’s meaningless they say
To not know the real.
Perpetually I have known
Erring on for unknown men –
Tinting light from shadows
In woes of day and night.
No rule to be; seek denial,
The only way to wait and fall.
I dropped the teaspoon with a clang,
Stopped measuring for all.
The lovers come and go,
Leaving memories to sow.

Grieving to live in fail
Hoping wrong to be well;
Forgetting the same old,
The very sane few –
Mattering the vague and obtuse
Crying in pain, misery, and abuse.
The forgiveness forsaken in me;
The love knows no more.

Take or give a love all fine
Sipping tea and tasting wine.
Can you do the washing, of tears and sins?
There will be no time;
Not anymore.
Little for you, lesser for me
Out for anyone who dare.

Now and then subliming in fury
Never recovered from the pain fully.
Maimed the innocence
And nipped the bud,
Lusted the experience;
Made love too hard.
Looking through the celluloid frame
Leaning tall and droopy eyes
And me, upended the blame!
That's odd, they said.
They say I had loved in vain.
Really now, what did I gain?
Oh darling, I am no Phoenix
They said, yet I rise
I fall out but not close for repair.
They asked me to be awry and beware
To leave all behind.
What was there except pain
To go through this again?

No one had any idea really,
Never did actually.
Let the shame reside,
Let the slut take pride.
I laugh in pity and cry,
Such beauty and terror it was
The story of you, and they say us.
None will talk less or more
Calling her Madonna or the whore.
Embalming those breaks in heart;
Afterall, life is an unedited piece of art.

Illustration: Sudeshna Chowdhury

Whisker | Sudeshna Chandra

'Splash . . .!'

Ripples rang across the dark Mississippi. I looked above to see the starry sky, like sugar sprinkled on a dark cloth. Just a few hours back the clouds had retreated, taking with them the rain drops. I took a deep breath. There was a light breeze. 'Huh!' I sighed. It was time for me to return back to my cabin. I was in an uninhabited place, in the middle of the woods, on the banks of river Mississippi on the lap of nature.

I was an author by profession and in the last few years I had become quite well known. Some of my books included – *The Lost Pendant*, *The Family of Supernatural*, and more which had gained immense popularity and which were slowly weaving their way into movies. Getting popular in the celluloid world does seem to be quite an achievement and I had thought so too, until I got involved, and then there were cameras that clicked wildly at me and the paparazzi always followed me whenever I walked down my neighbourhood, and this made me think otherwise. Eventually I became tired, and here I was completely away from the lub-dub of city life, in a place where the twittering of birds greeted me in the morning, and not an alarm clock; where the evenings were full of fireflies and other insects buzzing, and not the desperate honking of cars. I took my camera and got up. I was about to turn around when I heard a noise. I turned to stone. Nobody was supposed to be there. As I have already mentioned that this was a completely uninhabited isle and as far as I had been briefed, this was a place which was supposedly known to be haunted. And for that reason, no one preferably ventured this far into the wood. However, this was just a rumour and the ones who had been here had previously filled me in with the enigmatic beauty of this isle. However, after coming here, I had just thought that whatever they had told me was just a slice of what all there was to see and feel; nothing, not even the enchanting beauty of the crescent shaped moon could relieve me. Beads of sweat were clustered upon my forehead. I waited for a few moments.

When I didn't get to hear anything further, I heaved a sigh of relief! "I suppose my ears were just tricking me."I said to myself softly and smiled self- consciously. I was about to move away when I saw a shadow behind me. I froze again. I gulped. I was fixed to one spot. The noise again erupted from nowhere. I gathered all the pluck that I owned and turned around. There was no one there. Tears had choked my voice. I kind of mumbled to myself as I said, "Who is there?"I was totally and completely freaked out. There was no response. The sound continued. I was not being able to hold back my fear. I felt like crying out loud and screaming for help. I was taking deep breaths . . . completely beside myself in fear. Suddenly I started hearing a different noise. It was like somebody treading on leaves which had fallen from the tree and were lying on the path. 'CRUNCH . . . CRUNCH'. I felt that the noises were somehow familiar. My fear slowly started finding its way to a suspicion. Was it her? I turned around and looked a little down, still hesitating a bit. I could say that my body had just

abandoned me for a moment. I was ready to cry out of relief. I looked down at her and shook my head and said sternly,"You are absolutely of no use! Just fooling me like this! What if I had a panic attack?" She looked back at me with her innocent and expressive eyes.

It was like, whenever I started scolding her,she would look at me with those eyes as if she didn't even have a hint of what exactly I was talking about. She was dressed in her brown coat with black stripes. She looked up at me as I said in a softer tone, "Come on my girlie follow me into the woods and please don't go away again." I never knew before that incident, that squirrels were so mischievous!

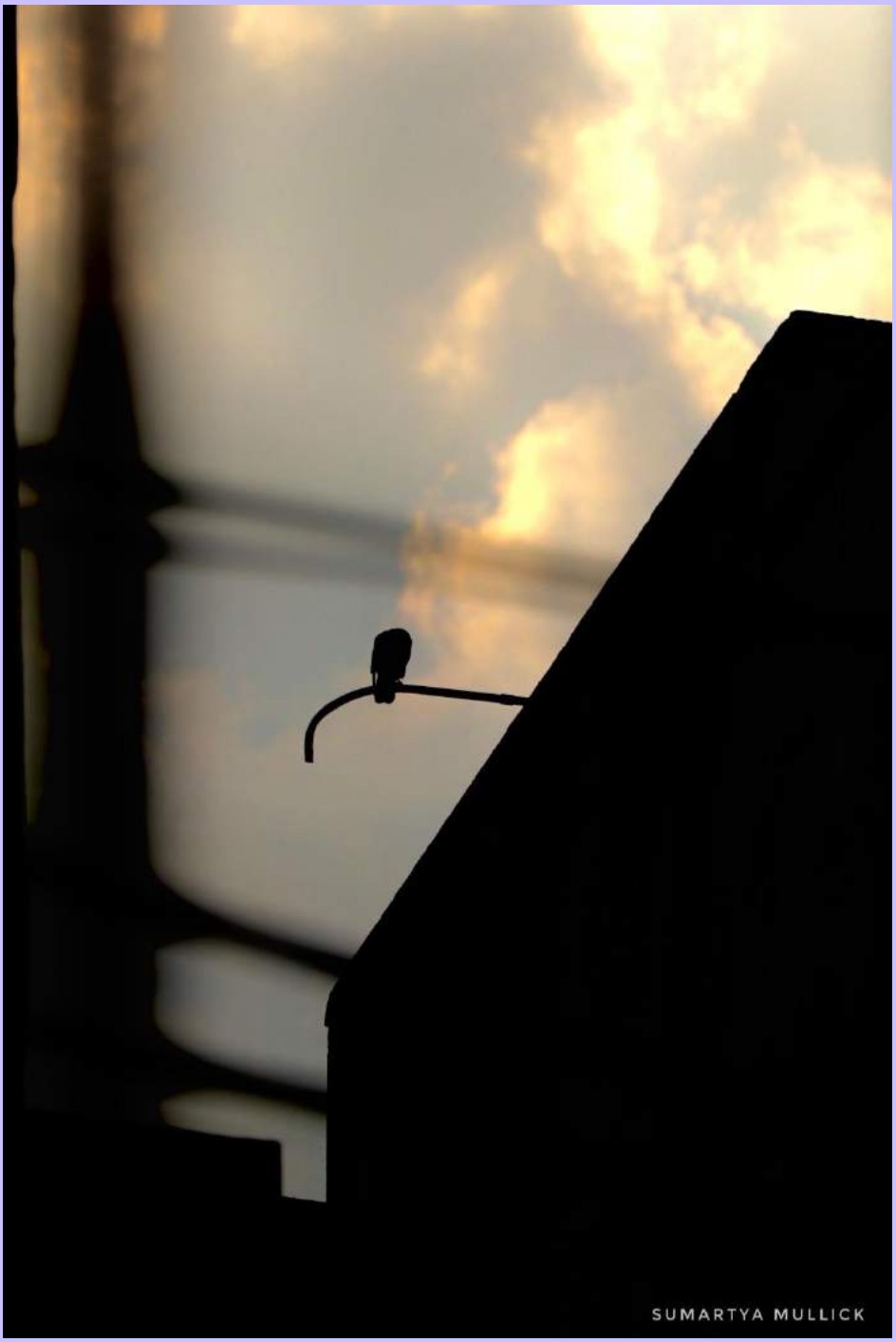

Illustration – Sumartya Mullick

If Paper Could Speak | Abhijit Sarkar

If paper could speak, you would be mesmerized,
How every story we see, has its own anecdote.
It would open up doors which are supposed to stay shut,
As the spangle-covered gates are only to be shown.

If paper could speak, you would know
How empty the mother felt, with tear scarred cheeks,
While writing a eulogy for her beloved daughter,
Who died in the satanic hands of that paedophile.

If paper could speak, you would know,
The pain behind every word wrote on that diary
Of the girl who was forced to marry a boy.
But every sleepless night her palm bleeds words of suffering.

If paper could speak, you would know articulately,
The embarrassment that little child experienced,
With every word and push delivered by the class bully.
He couldn't do anything but doodle his feelings.

If paper could speak, you would know,
How they forced their hearts to sign those pages,
Even though they knew they cared for each other.
But misunderstanding overwhelmed their love filled strings.

If paper could speak, you would know
How the mind of the artist wandered like a wannabe,
While he looked out the window, ignoring the sums.
Every page of his notebook knows his true aspirations.

If paper could speak, you would know
The emotions behind every alphabet imprinted on the sheets.
If papers could speak, I know,
They would be the greatest orator of all time.

Illustration – Shirsa Nandi

Love's a bird, set it free | Rodoshee Das

Have you ever thought what's love? Have you ever thought why do we "fall" in love and not rise? Have you ever thought why we want to be loved and not love someone first? Have you ever thought why we think of love as something to only receive and not give? Strange enough right?

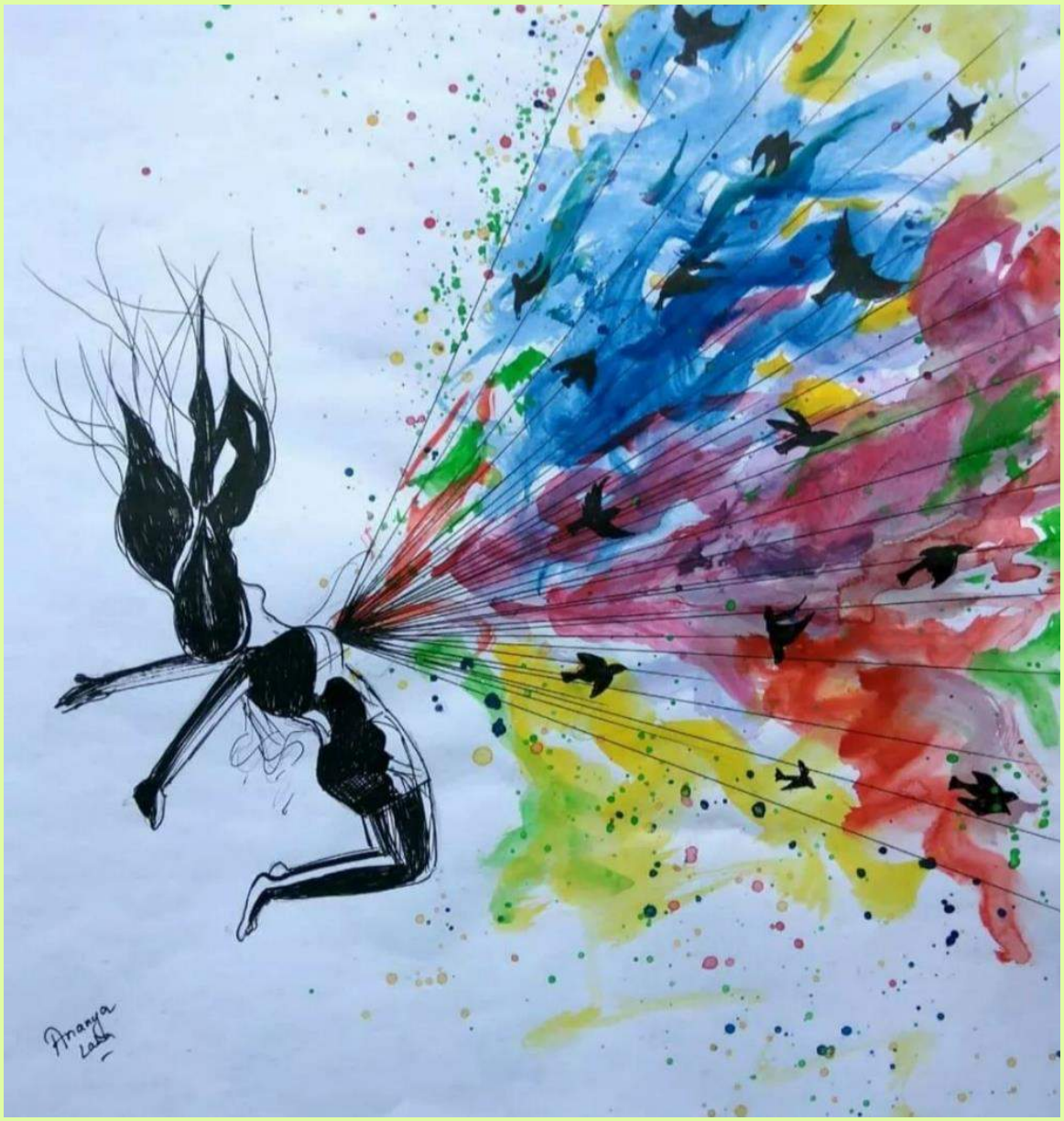

Love, it's a mysterious word that makes the world go round. Well, am not talking about the parental or fraternal love, am talking about the romantic one. Because that's what the world is only concerned about; fortunately, or unfortunately that yours to decide. There are so many facades of love which remain unexplored by us, right? Some are lucky to explore few, some are not. But have you ever thought why we depend on this emotion so much that it can alter our life or is capable of turning everything upside down? As for us, love equals possession and not freedom.

We hardly respect the unconditional love we are gifted by our family; well some aren't lucky to get that but most are. When we are children, we feel the first taste of love from our mother, then we start feeling it more from our father and other family members. But as we grow up, we start to think that we are entitled to receive such love, and that there's nothing special about it. Don't you think that the day we arrive at this conclusion, we take "love" as something to be taken for granted? As something that every person we feel is 'close' should give us? As something which is an object we must possess? Just as if we are children and we have to own that toy we came across in the nearby shop, which we used to whine to our parents to give us? Is it the fault of our parents to love us and make us arrive at this or is it the society's problem that projected love as something closely related to ownership? As these rushes through those convulsions of our brain, it becomes a fact to us and it goes on governing all the relationships we ever share with people in our life, mostly romantic. Love becomes an exotic bird, caged by us.

How many of us truly loved someone? And that too without any returns? Sounds terrifying right? In pop culture, we give it the name of unrequited love. But have you ever questioned why we call it "unrequited love" and not only "love"? Is it a business deal which comes with a balance sheet where both asset and liability columns should be filled? Sure, when we come to know that we loved someone without them loving us, it feels like a boulder placed on our heart . . . yet, is love an accountancy chapter? I don't think so. Love is called so, as it's an emotion which we feel for someone when we really like them. But that doesn't anyhow define that it should be returned. Love happens without calculation as humans say; it's the only thing in the world that doesn't follow mathematics, then why does it follow so when someone is at the receiving end?

We are capable of loving someone without returns. We are capable of loving someone without treating them like that pretty furniture we "possess" at home. We are capable of standing at the giving end and not get anyone at the receiving end. Just placing ourselves beyond calculations can make this happen. Love listens to heart, then why let brain rule us when it comes to getting love? And for those who say love happens truly, only once, you're wrong. Love can happen once, twice, thrice . . . it doesn't follow any algorithm, it comes in all shapes,sizes, and dynamics, just like it doesn't follow so when we start to love someone. Love should be set free and yet be responsible enough to care for someone. It should be set free and yet be enough to give a person his or her independence. It should be set free and yet be capable of letting someone go. It should be set free and yet be able to yearn for someone living miles away. That's true love. A love which flies high above in the sky, and lets you rise and not 'fall in'; helps you grow and not fail as a human; gives you strength and not weakness; makes you feel comfortable and not give you butterflies; makes you feel desired and not possessed.

Now you may question me and claim that I never felt like this for someone and that it's easy to preach rather than practice, and that we are not as great as someone with holy power to

be satisfied only by giving. But the only answer I can give to you is, I have been in love, I loved someone who was never mine as I didn't possess him, I loved someone who was someone else's (as society quotes so) . . . yet, I loved him; without returns, without any expectations, without any desire that he will come back to me someday. I confessed my love but without a fear of being judged. I did it just to stay true to myself and the person I love, as Augustus Water said "I'm not in the business of denying myself the simple pleasure of saying true things".

Just go ahead, feel love like love is, a free bird who prefers the sky and the forest over a cage; which shouldn't be a cause of heartbreak but a cause of knowing oneself better; of realizing how love is beyond every realm in the world; love is sunshine, not a gloomy dark night, trust me, you will feel the bliss!

Illustration – Ananya Laha

And we are torn to shreds? | Anwesha Mandal

Labyrinthine airy nothings
Entrap my being.
My heart cowers,
As you pluck at its strings.
Your embrace is my cocoon
And our tears mingle
Under the bleeding moon;
Darkness and showers vespertine

Envelop us,
As I cling on to you
As if I were a vine.
Your breaths seep deep,
Deep into my skin;
My eyes plunge into
A seemingly endless dream.
Our empty vows time does flocculate
Into a mass of nothingness;
Between hope and despair,
Hopelessly do we oscillate.
What if it melts away,
As the darkness fades?
What if there's a sudden holocaust,
And we are torn to shreds?

Illustration: Tiyasa Chatterjee

GUEST COLUMN

GUEST COLOUMN

Musings on the Real and the Virtual | Ramchandra PN

Polish filmmaker Krzysztof Kieślowski's 1987 film *Blind Chance* has the main character run fast into a railway platform to catch the just departing train. There are three segments to the film placed one after another – each showing things that happen to his life, with all the philosophical and political dimensions to it, when he either catches the train or misses it. In each of these episodes, the protagonist goes through a series of distinct set of events that are activated by a host of characters that he meets and interacts with.

Asad J. Malik, a USA resident with Pakistani origins, created an Augmented Reality (AR) work in 2018 called 'Terminal 3', where the viewer, after wearing a headset that gives access to the virtual world, dons the role of an immigrant officer at an airport. The 'experience seeker' would have to select one of the six holographic characters who have just landed in the country and ask questions to them as an immigration officer would. As the interrogation gathers pace, the selected hologram which is initially only in the form of lines and shapes, starts getting clearer until we get to evidently see the features of the person sitting virtually on a chair that is in 'reality', physically in front of you. Ultimately, the experience ends when the participant has to decide if the immigrant is to be let into the country or not.

These two works, differentiated by a span of about three decades each, share a thing in common. They give the participant a certain degree of choice in the experience that is being partaken. While Kieślowski places all the choices in front of you in a linier and detached manner, Asad lets you choose between the six characters with whom you want to interact and have an experience.

But Asad differs from Kieślowski in one fundamental way – by making the participant an actor and a character in the whole process, he 'immerses' him/her right at the center of the situation that could well seem 'real'. The personal biases and prejudices of the participant inherent in selecting the holograms as well as in framing the questions can change the course of the 'reality' that could shape up the virtual experience. Therefore, while *Blind Chance* has a fixed length of time that it projects itself on to the screen that which every viewer would have to endure; in 'Terminal 3' the temporality of such nature is decided by the selection of the candidate and the questions thrown at them by the participant. Kieślowski places three 'realities' in front of you so for your consideration; Asad stipulates you to shape up that 'reality' that most likely suits your temperament.

Getting into the realm of 'reality' has always been the quest with human kind. It could be either in the area of metaphysical 'reality' or in depending on empirical evidences to know the fundamental nature of things and matters, bringing in an amount of objectivity into the

whole discourse. Art too, post the scientific revolution, got into the objective 'realist' mode – in literature, in painting, and elsewhere. The invention of the still photography brought a sense of 'realistic' representation that even painting could not hope for – and when these still images got movement in the form of cinematography, it became one of the inventions of the century. The viewer could now watch the 'objective reality' that would be projected on to the screen.

The level of 'realistic' representation went up a notch higher when sound got added to movement in cinema, initially in a mono track where all projected sounds came from a single source. It soon got into the stereo mode that had two sources, then five and seven sources in the surround sound projections. You not only heard sounds from the front, but also from the sides and from the back. Presently, new technology allows one to hear sounds from all 360 degrees, placing the viewer right at the center of the action giving them 'real' sense and experience of the action. The immersion into the aural 'reality' can probably be seen as complete.

With visuals, as the celluloid raw stock gauge went from 16 mm to 35mm, to Cinemascope and to 70mm, the theater screen sizes grew larger by the year. Dome theaters in science museums and theme parks covered about 180 degrees of the audience views horizontally and 100 degrees vertically. And over the past few years, screens that cover 270 degrees were being experimented with and were just about to be picked up when, as if by conspiracy

favoring the virtual world, Covid struck this 'real' world. The idea – similar to the one that 360 degrees surround sound has, is obviously to 'immerse' the audience into the visual 'reality' of the action that is being experienced. Does such audio-visual immersion into the 'real' give one a choice of any kind? Well . . .

On the visual front, there was another trend that had been shaping up over the years – the projected screen simultaneously also got smaller and smaller. The television brought 'real'

action right at your door steps and into your drawing room, the desktop and the laptop to your bedroom and office. And then, the mobile phone brought it right on your palm – you could have access to 'reality' as you moved from your home to a park or elsewhere. It made the watching experience less immersive as the surround sounds that were emitted from the 'real' world also had to be accommodated along with those that came from the mobile phone. And then there were events in the 'real' world that were to be dealt with. One had to stop watching the video if the train station arrived, when the doorbell rang, or when the internet connection was too slow for the video to be played.

It is not exactly an ideal situation for the traditional movie maker who often demands full attention from his/her viewer for the created work. Since there are other factors for the viewers to deal with in the 'real' world while watching or experiencing, the time that he spends at a stretch on a movie by logic has therefore decreased. Movie makers responded by making shorter episodic movies – some as short as ten seconds as the Tiktok movies are. These are the ones that start and get over even before your mother could call you for breakfast after ending her morning prayers or before your husband could even take off his eyes from the newspaper. The viewer now can choose to stop watching the longer movies, pick them up later on when needed, or maybe not revisit them at all.

Over the years, the visuals that the viewer watches have become so less that they now are threatening to come right in front of your eyes, to take the shape of your glasses. That is what Asad J. Malik did when he exhibited his Augmented Reality (AR) experience. Back then, the

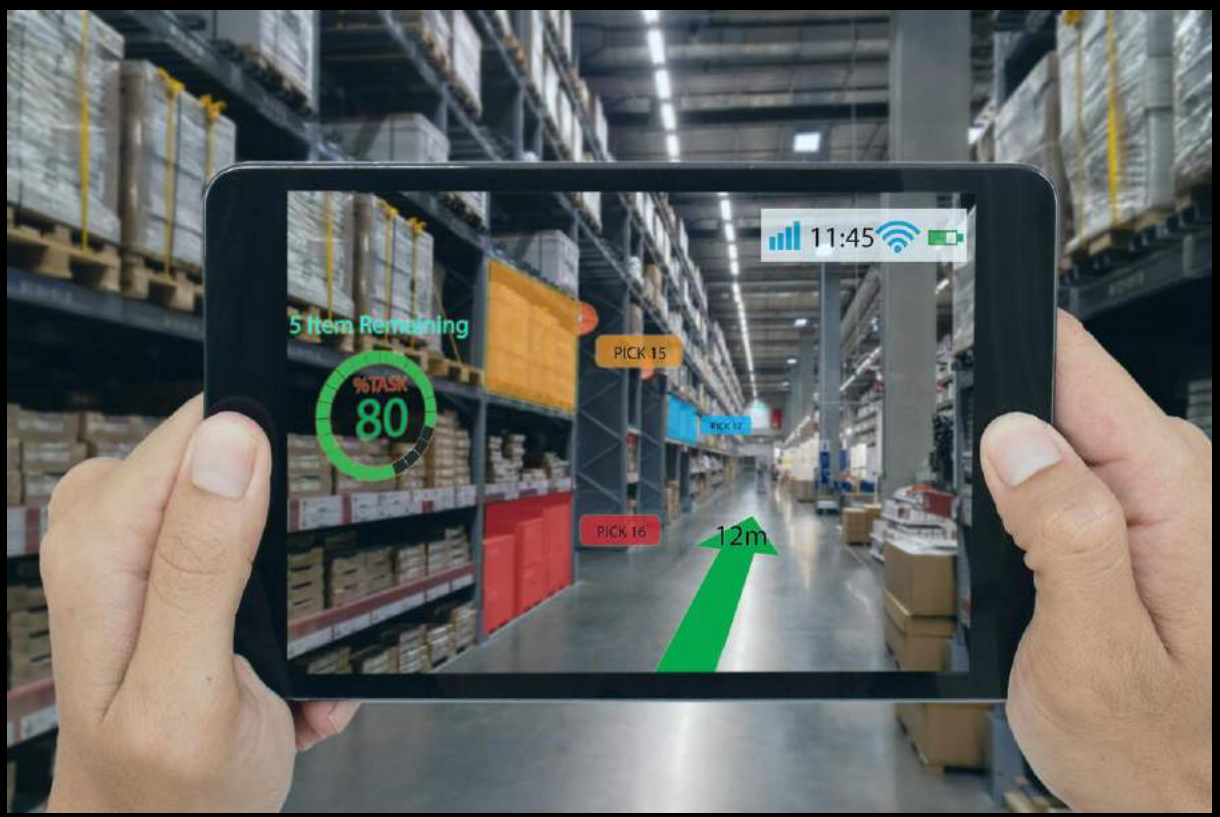

dome screens were huge and it gave you the experience of being amidst the 'real' action. Augmented Reality (AR) headsets, on the contrary, are smaller; they still give you a similar feeling that you are 'really' amidst the action, if not heightening it.

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Augmented Virtuality (AV) are phrases that might baffle a traditional movie maker like me who is up till now used to the liner kind of a narration, even when dealing with a non-linier time as did Kieślowski. Suffice to be informed that these phrases represent a range of variations between the 'virtual' and the 'real' world that are to be projected, participated, and experienced.

In the process of giving an experience to the participant, Virtual Reality (VR) totally cuts off the participant from the external 'real' world and immerses him/her fully into the virtual. Augmented Reality (AR) and Mixed Reality (MR) allows you to mix the 'real' world with the 'virtual' world, in varying degrees, and Augmented Virtuality (AV) allows the participants to manipulate the 'virtuality' which could include things like projecting oneself into the virtual world in some form or projecting even 'real' objects onto it.

Phew!!! It is a whole new world out there that probably the likes of Kieślowski might not even have dreamt of when he made *Blind Chance*. No doubt the above applications would be useful in training, ecommerce, gaming, and other such spheres. But what does it mean to the traditional linier movie maker? What would it mean to create a work of art in this realm? What would be the aesthetics of such an expression? And the theoretical framework for its existence?

Imagine a three-dimensional virtual world that consists of a house with four rooms. You are the 'experience seeker', as you enter the door, you meet someone in the hall and go through a series of events interacting with that person. You might then decide to go into one of the inner rooms, where there might be another character, with whom you might undergo a series of different set of events. Or instead of going into room number one, you might decide to go into room number two, where you would encounter a different person and activate a totally different set of events. So is the case with other rooms.

And then maybe you decide to come out of the room that you have entered into and meet the first person, if he is still there in the room, setting off another chain of events. If the first person you have met is not present when you have come back to the hall, then another set of events take place. Imagine the kind of variations that the participants would be undergoing as various events are triggered in varied scenarios. If the participant wants to slap a person, a different set of events would take place and if not, a certain other set of events. After the slap, if the participant wants to apologise, that would have a different set of events and if there is no apology, a certain other set of events.

As a movie maker, one would have to create possible set of actions that would be complete and have, as Aristotle says, a beginning, middle, and an end. All these keeping in mind the characterizations, plausibility and the cause and effect factor intact; not to speak of the variations in soundscape, lighting, time lapses, costumes and other such aesthetic elements that come into play in the making of each of the possible plots. So literally, for the creation process to be complete one has to be making multiple movies that have as many plots so that the participant can make selections as per his/her whims, biases and prejudices, and have an experience. Kieślowski could think of three plots and Asad, six. If one of Asad's character took out a gun and had shot the interrogator/participant 'virtually' dead, that would have been his seventh plot.

Since these sets of actions are being created in the first place for the 'experience seeker', how many of them have to be created? Would there be a human design to it or would it be on the basis of the strengths and limitations posed by resources of the software or the hardware? If there is a human design to it – like keeping a certain set of actions out of the gambit in favour of certain others – what should that design be? Add to this the kind of interactions the participant would have with the 'virtual' world, and the level and intensity of them. What about the unpredictable design of the 'experience seeker' who is also an active part of the plots, without whom there is no immersive cinema at all?

And then, what happens if the 'experience seeker' who is interacting with the virtual world has one more 'real' life partner to deal with? What happens if two 'real' people enter the virtual world that have four rooms in it? The plot of these events would not only include the interaction between the 'real' and the 'virtual' but also between the 'real' and the 'real', in the virtual world. We probably have seen similar interactions in the gaming sphere, but how does it play out in the world of interactive cinema?

Imagine such 'branching narrative' situations in a VR/AR/ MR or an AV whose imagery might use 'volumetric video' (actions captured from all possible angles & processed into a 3 dimensional space to get the 'real' feeling of being there amidst the action) where you become and experience the feelings of a member of a family who is stuck in a housing colony surrounded by angry mobs baying for your blood for no fault of yours or you are a student of a University who is being discriminated on the basis of caste and is about to take a decision to end life or a situation where you enter the past to observe the unfolding of the events that lead to the killing of Mohandas Karamchand Gandhi in a 'virtual' space that could be generated using Artificial Intelligence, with existing B & W film footage of the 'real' as reference.

All these could sound overwhelming, but the possibilities are endless. It would by all probabilities mean going beyond the confines of moviemaking practices that we know of now. Experiencing interactive cinema might well get morphed into wearing dedicated glasses or headsets in small enclosed spaces – like say in the back of an enclosed truck instead of large movie halls. Although the technology is getting there and distribution of that technology hopes to get there, I am not sure if the traditional liner kind of a movie maker – the one that I represent – is still ready for it. Since we started off by discussing 'choices', I would end by

saying that in a few years' time we might be having none. That is when 'immersion' of the 'real' into the 'virtual' and of the 'virtual' into the 'real' could be overbearing and all encompassing. So, wouldn't it be better to start claiming and sharing that space which is presently largely in the domain of the techno wizards?

*****

Illustration: Google Images

GALLERY

Pinaki Biswas

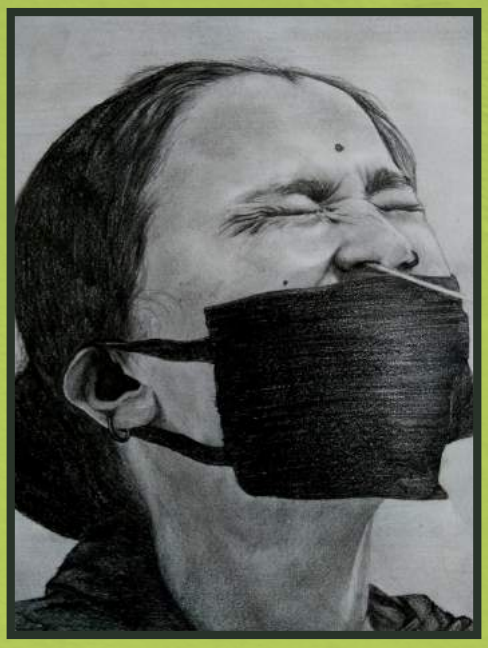

Sayanti Pal

Ranjana Sadhukhan

Soumya Kundu

Shreedatri Banerjee

Krishh Mukhopadhyay

Aryan Shaw

Rajashree Dey

Swati Sharma